জেন গল্প

বীতশোক ভট্টাচার্য

বাণীশিল্প

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৬১
প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর
রাধাবল্লভ মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হিরণ মিত্র

মুন্নিকে

ধ্যান থেকে ঝাণ। ঝাণ থেকে ঝেন। ঝেন থেকে জেন। জেন প্রাচীন ভারত থেকে চীনে জাপানে গিয়েছে। জেন যোগসাধনা ও বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে। এ মতবাদ শেষ পর্যন্ত সব তত্ত্ব ও মনন পার হয়ে যায়, সত্য বোধ আর বোধিদৃষ্টির কথা বলে। হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এর লক্ষ্য। যদি কোনো জেন সাধককে প্রশ্ন করা হয় 'জেন কী', তার উত্তরে তিনি হয় তো চুপ ক'রে থাকবেন। এই মৌনই জেন। বুদ্ধ একবার ধর্মদেশনার সময় শ্রাবক-দের কিছু না ব'লে সদ্য উপহার-পাওয়া একটা ফুলের তোড়া সামনে উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন : শুধু এই ছিল তাঁর সেবারের উপদেশ। জেন কী এ প্রশ্নের উত্তরে আরেক জেন সাধক শিষ্যদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই বিস্তারই জেন। আসলে গাছের পাতার তুলনায় মুঠোর পাতা যেমন কম সেরকম অনুভূত জেনের তুলনায় জেনের প্রকাশ কম। না-বলা বাণীর ঘন অন্ধকারে জেনবাদ তারার মতন, অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়া কোনো তারার আলো যেন অনেক আলোক-বর্ষ পার হয়ে পৃথিবীতে এখনই এসে পৌঁছল। একবার স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো, দেবতারা জেন সাধকের প্রশংসা করলেন। সাধক বললেন : প্রশংসা কেন, আমি তো কিছু বলি নি। দেবতারা বললেন : আপনি কিছু বলেন নি, আমরাও কিছু শুনি নি। জেন এই। এই জেন।

ধ্যান থেকে যদি জেন হয় তবু জেনবাদ মানে শুধু আসনপিঁড়ি হয়ে নাকের ডগায় চোখ রেখে বসে থাকা নয়। জেনমঠে ঘড়ির কাঁটা ধ'রে সারাক্ষণ কাজকর্ম চলছে চলবে। ধ্যানের ভান করে সেখানে পেটের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো উপায় নেই, তেমন করলে পিঠে গুরুর লাঠির ঘা এসে পড়বে। জেনবাদের নৈষ্কর্ম্য নিষ্কর্মাদের জন্য নয়, তা পরি-

শ্রমের ভিন্ন নাম। প্রশান্তির নাম ক'রে সেখানে ঘুমিয়ে পড়া নিষেধ। জেনবাদ নিজেকে আঘাতে আঘাতে বেদনায় জাগিয়ে তোলার জন্য। অন্যকে আরো চেতনায় আরো বেদনায় জাগিয়ে তোলার জন্য। না ধূপ না দীপ না মন্ত্র না নৈবেদ্য জেন সাধকের কিছু লাগে না। জেনের কোনো আশ্রয় নেই। জেন কারো নির্ভর চায় না। জেনবাদী জানেন : টোকা নয়, ধাক্কা দিলেই আচমকা দরজা খোলে। তোরণ-নেই, এমন এক তোরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি জেনবাদকে বুদ্ধহৃদয় বলেন, তাঁর প্রিয়তম পুঁথি লঙ্কাবতারসূত্র। হয়তো ধ্যানঘরে ব'সে শীতের রাতে জেনসাধনা করছেন, জালানি নেই, আগুন নিবে আসছে, হি হি হাওয়ায় মনোযোগ ভেঙে যাচ্ছে। জেন সাধক কুলুঙ্গি থেকে কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি আগুনে ছুঁড়ে দিলেন, খানিকটা ঝিকিয়ে উঠে আগুন আবার ম'রে এলো। আর হাওয়া ছুটে এলো হু হু করে। জেন সাধক লঙ্কাবতার সূত্রটি ছুঁড়ে দিলেন, ঝলসে উঠে আগুন তখনই খেয়ে ফেললো পাতা, পুঁথির পাটা, তারপরই নিবে আসতে থাকলো। এবার উঠলেন জেন সাধক, ধ্যানঘরের দেওয়াল থেকে দুচারটে তক্তা তুলে এনে আগুনে নামিয়ে ঠেলে দিলেন, ফের সমাহিত হলেন—নিস্পন্দ, নিশ্চিন্ত। এবার প্রবাহিত হও উত্তরের হাওয়া, যদি ইচ্ছা হয়। জেন সাধক ধ্যানস্থ হয়েছেন। অথবা অন্য কাজ করছেন। মা যেমন গর্ভের শিশুকে সচেতন বা অচেতনভাবেও বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে বেড়ান তিনিও তাঁর চিত্ত পোষণ ক'রে চলেন।

হাত পা ঝাড়া অভিযাত্রী তরতরিয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠে যায়, সেখানে তীক্ষ্ণ চূড়া নীলিমাকে হিম ছোরার মতো বিঁধছে, আর হাওয়া এমন নির্মল যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তখন নাকি এক একটা এমন দৃশ্য দেখা যায় বুদ্ধিতে যেন তার ব্যাখ্যা চলে না। জেন সাধক এ অনুভবকে সটোরি বলেন। এ যেন তৃতীয় নয়ন খুলে যাওয়া, এ যেন অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন। না প্রণিপাত

না সেবা না মেধা না শ্রুতি কিছুতে কিছু হয় না। প্রজ্ঞা এলে এমনিতে আসে, না এলে কিছুতেই আসে না। তখনো আনন্দ অর্হৎ হন নি, এক রাতে হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে মাটিতে প্রায় ভেঙে পড়ছেন, সহসা তাঁর সটোরি লাভ হলো। জেন গল্প এই সব চোখ খুলে যাওয়ার গল্প, সটোরি লাভের গল্প। নিথর জলের আয়নায় মুখ দেখার অর্থ বোধি পাওয়া। বোধি পাওয়ার অর্থ ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া দেখা। দূরের খাদ থেকে স্পষ্ট উঠে আসা নিজের প্রতিধ্বনি শোনার অর্থ বোধি পাওয়া। এই হলো জেনসাধকের আত্মদর্শন। সটোরি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় লাভ করা যেতে পারে। কোনো সাধক মঠের পর্দা তুলতে গিয়ে সটোরি পেয়েছেন। কোনো সাধক জালানি কাঠ নামাতে গিয়ে সটোরি পেয়েছেন। সাধকের বোধি পাওয়া শিল্পীর বোধি পাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। রামকৃষ্ণ কালো মেঘের পটে শাদা হাঁসের দলবেঁধে উড়ে চলা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আকাশে তরঙ্গিত বিস্ময়ের জাগরণের মতো হংসবলাকার উড়ে চলা দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সদর স্ট্রিটের বারান্দায় সূর্যোদয় দেখে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখেছিলেন : একে কেউ এপিফ্যানি বলবেন, কেউ সটোরি বলুন। ফুল যেমন সহজে ফুটে ওঠে, সটোরি তেমন সহজে পাওয়া যায়। চর্যা-গীতিকার যাঁরা তেল-বেচতেন মশলা-পিষতেন তাঁত-চালাতেন ফাঁসি-দিতেন তাঁরা এই সহজ পথে বোধি খুঁজেছেন।

একদিকে জেন এক অনুত্তর যোগ। এ যেন চিরপ্রশ্নের এক বেদীর চিরনির্বাক হয়ে থাকা। লঙ্কাবতার সূত্রে এই মর্মে একটি গল্প আছে। রাবণরাজা বোধিসত্ত্বকে বলেছিলেন যে বুদ্ধ যেন এই অনুভূতির বর্ণনা করেন। বলতে বলতেই তিনি দেখলেন যে তিনি আর পাহাড়ের উপর প্রাসাদে বসে নেই। তাঁর সামনে থরে থরে অনেক উজ্জ্বল পাহাড়, প্রতি

পাহাড়ের শিখরে এক এক সমাহিত বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধের সামনে এক একজন বোধিসত্ত্ব ও রাবণরাজা দাঁড়ানো। আর তারপর কোথাও কিছু নেই, রাবণ রাজা তাঁর প্রাসাদে, একা। রাবণরাজা তখন ভাবলেন : কে প্রশ্ন করলো, কেই বা উত্তর দিল, এসব ঘটনারই বা মানে কী? শেষে রাবণ-রাজা নিজের মনে এ ভাবনার সমাধান খুঁজে পেলেন। প্রতিটি জেন গল্পে নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে এই সমাধানের খোঁজ করার ব্যাপার আছে।

তত্ত্বজ্ঞানী নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করছেন : পাপপুণ্য জন্মমৃত্যু ইতিনেতি সুখদুঃখ। অনাসক্ত জেন সাধকের কাছে এসব ফালতু বুদ্বুদ, এ সমস্ত কথার কোনো অর্থ হয় না। জাগার পর ঘুমিয়ে না গেলে যেমন স্বপ্ন আসে না তেমনি 'হ্যাঁ'-র পর 'না' পেরিয়ে না গেলে জেনের বোধ আসে না। জেন না চাইলে পাওয়া যায়, ত্যাগ করলে হাতে আসে। জানো, দ্যাখো : এই হলো জেনের মূলমন্ত্র। জানাই জ্ঞান। দেখাই দর্শন। রোজ রোজ বেশি বেশি পড়ে কেউ পণ্ডপণ্ডিত হন। জেন সাধক রোজ রোজ ভুলে মূর্খের মতো নির্বোধ হন, শিশুর মতো অবোধ হন। তিনি এমন বুদ্ধুর মতো থাকেন যে লোকে বুঝতে পারে না তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি এমন সহজ সরল কথা বলেন যে লোকে ভাবে তিনি একেবারে নিরেট আর আকাট। একজন বলেছিলেন : আমি বদ্ধ, আমাকে মুক্তির পথ দেখান। গুরু বললেন : কে তোমাকে বদ্ধ করেছে? শিষ্য বললেন : কেউ না। গুরু বললেন : তা হলে তো তুমি মুক্ত। রাত্রির অবসানে প্রভাত নয়। যখন চিত্ত জেগেছে, বাণী শুনেছো, তখনি প্রভাত এসেছে। আর তুমি অমেয় আলোয় জ্বালিয়ে তুলেছো নিজেকে। বুদ্ধকে বাইরে থেকে খোঁজা নিজের ছায়া ধরার মতো অর্থহীন, নিজের প্রতিধ্বনি ধরার মতো নিরর্থক। বুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া আর নিজেকে খুঁজে পাওয়া একই কথা। না বুদ্ধ না ধর্ম না সংঘ, জেন-যদি চাও তবে নিজে নিজের শরণ নাও। আত্মদীপ হয়ে ওঠো।

তাই সবার কাছে যা নিশা জেন সাধকের কাছে তা জাগরণের সময়। এই নক্ষত্রমালিনী রাত ঘুমিয়ে কাটানোর নয়। জেনসাধক পালটা জবাব বানান, উল্টো কথা বলেন। সবাই বলে বোধিবৃক্ষ। জেন সাধক বলে বসেন : কই, বোধি তো বৃক্ষের মতন নয়। সবাই বলে, আত্মা দর্পণের মতো। জেন সাধক বলেন : আত্মা খুঁজে ফিরে এলাম। আয়নার ভাঙা কোণাটুকুও মিললো না। তাহলে আমার মলিনতা কোথায় জমবে? এভাবে জেনবাদী নিজের মনের মধ্যে সব প্রশ্নের সব উত্তরের খোঁজ করে চলেন। গাছের পাতা কেন নড়ে? এ জিজ্ঞাসার নিজস্ব উত্তর দেন। গাছের পাতা নিজে নড়ে না, হাওয়া তাকে নাড়ায়। না পাতা না হাওয়া কেউ কাউকে নাড়াতে পারে না। পাতা নড়ে ব'লে হাওয়া নড়ে, হাওয়া নড়ে তাই পাতা নড়ে। জেন সাধক শেষ কথা বলেন, দ্বিধার বিতর্কের অবসান ঘটে : মন নড়ে, তাই পাতা নড়ে, তাই হাওয়া দেয়।

এসব কথা হেঁয়ালির মতো শোনায়। গুরু শিষ্যকে ধাঁধা লাগানো এক একটা প্রশ্ন দেন, তাকে বলে কোয়ান। শিষ্য দিনের পর রাত, দিনের পর দিন এই কোয়ানের সমাধান ভাবেন। কোয়ান থেকে সটোরি আসে, সটোরি থেকে জেন। বোধিধর্ম কেন চীনে এলেন, এটা জেন সাধকদের একটা প্রিয় প্রশ্ন। এর সম্ভাব্য উত্তরগুলো বিদঘুটে, অদ্ভুত। এক চুমুকে এই নদীর জল খেয়ে ফেলো, তাহলে বুঝতে পারবে। তোমার মাথার উপর আরেকটা মাথা হোক, তাহলে বুঝতে পারবে। তুমি এর উত্তর বলবে না, বললেই মাথায় শিং গজাবে। উপনিষদের ঋষি জিজ্ঞাসুকে ভয় দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন : আর প্রশ্ন কোরো না, তাহলে তোমার মুণ্ডু খশে পড়বে। জেনসাধক শিষ্যকে এমন ভয় দেখান না, তিনি শিষ্যের মনে প্রশ্ন, আরো প্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্ন জাগান। প্রশ্নের তীব্র সংবেগে উত্তর আসন্ন হয়ে আসে। সামুরাইদের ক্ষিপ্র তরোয়াল চালানোর মতো জেনবাদে

কথোপকথনের ভঙ্গিতে প্রশ্ন চালাচালির বিশেষ স্থান আছে। কথার পিঠে এমন সব কথাকে বলে মন্‌ডো। শিষ্য জানতে চাইলেন, জেন কী? উত্তরে গুরু বললেন : জেন কী? এই হলো মন্‌ডো। এবং এই হলো জেন। নিজে জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি জেন নিজেকেই শিখতে হয়, তা কেউ কাউকে পাইয়ে দিতে পারেন না।

জেনবাদে যে নির্বাণের কথা আছে তা নিবে যাওয়া নয়, সহসা সাহসী জ্বলে ওঠা। জেন কী বুদ্ধ যখন জেনেছিলেন তখন তাঁর এক একটি লোমকূপ থেকে এক একটি নক্ষত্রলোক জেগে উঠেছিল। তাঁর দুই ভুরুর মধ্য থেকে সূর্যের জ্যোতি বেরিয়ে এসেছিল। জেন এমন প্রথম প্রভার আলো যার মধ্যে সাধক নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। জেন গল্প পড়তে পড়তে পাঠক হয়তো এক প্রথম আলোর প্রসাদ পাবেন।

চীনের জাপানের শিল্পে সংস্কৃতিতে জেনবাদের অভিঘাত একটি বড়ো বিষয়। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এখন ক্রমশ এই অভিঘাত বলয়িত হয়ে পড়ছে। মানুষের জন্ম হয়, জেন মানুষকে আদর্শ মানব ক'রে তুলতে চায়। এ মানুষ দোলাচলতার মধ্যে থাকে, তাকে টলানো যায় না। এ মানুষ পাপ করে না, ধর্মপালনও করে না। কোলাহলের মধ্যে সে শান্ত ও স্তব্ধ, উৎকেন্দ্রিক টানের মাঝখানে সে আত্মস্থ, আঁকাবাঁকা অথচ নির্ঘাত শরের মতো সে ঋজু। তার স্তব্ধতা হাসিতে বিস্ফারিত, তার নৈষ্কর্ম্য পরিশ্রমে বিস্তীর্ণ। তার ইতিহাস শূন্যতায় চমৎকার জাগরণের ইতিহাস। জেনবাদের অজস্র পুঁথিতে এই জাগরণের সহস্র ইতিবৃত্ত লিখিত আছে, তবু জেগে ওঠার হাজার এক বিবরণ কথা দিয়ে কিছুই প্রকাশ করা যায় না। জেন বুদ্ধির অতীত, জেন বোধির সামগ্রী। অর্থের অভিব্যক্ত ছায়া ও অব্যক্ত উপচ্ছায়া দিয়ে সেই তাৎপর্যকে ধরা যায় না। জেন নীরবতায় বীণা বাজানো, জেন নিরক্ষিত চিত্রণ। যিনি জেন কী জানেন তিনি হয়তো তিন

পংক্তির এক হাইকুতে তাঁর ঘনীভূত অনুভব ভরে দেন, প্যারাব্লপ্রতিম একটি গল্পে পূরে দেন তাঁর উপলব্ধির সারাৎসার, একটি ছোটো গান সুরভিত ক'রে তোলেন তাঁর সত্তার নির্যাস দিয়ে, একটি বিরল রেখায় স্পন্দিত করে তোলেন এক পরিপূর্ণ শূন্যতার ছবি, আর হঠাৎ ফেটে পড়েন কুরোশাওয়ার এক চরিত্রের মতো অভীক সাংঘাতিক হাসিতে। যেন বাইবেলের সেই উড়নচণ্ডী বাউণ্ডুলে ছেলে শুভদিনে পিতার ভবনে ফিরে এলো, এসো, তাকে মোটা বাছুর কেটে দাও। জেন মানুষের কাছে এমনই এক আনন্দের সংবাদ।

জেন কী তা জানার পরিশ্রম ভয়ানক, তা জানার আনন্দ কম নয়। জেন থেকে প্রাপ্তি নিশ্চয়তা, স্পষ্টতা জেন থেকে প্রশান্ত অর্জন। সংরাগ আর উচ্ছ্বাস একসময় সরে যায়, তখন জেন আসে ; বেলাভূমির উপর গড়িয়ে যাওয়া ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের সূক্ষ্ম সুন্দর আলপনা, মননের স্বাভাবিক নৈর্ব্যক্তিক নান্দনিক বিন্যাস আঁকা হতে থাকে। না, অন্য কোথাও নয়, অন্য কোনোখানে নয়, এখন, এইখানে, এই সংসারের মধ্যে জেন সাধক নির্বাণ চান। যেন একটিই পরম লগ্ন জীবনে আসে, তিনি সেই ক্ষণটিকে কখনো হেলা করেন না, অমোঘ এক বাণে লক্ষ্যভেদ করেন, এই সমর্পণকে নির্বাণ বলেন। মঠের বাগানের মাটি কোপাতে গিয়ে কোদালের ডগায় সবুজ একটা চাপড়া উঠে আসে, নীল ঘাসফুলের উপড়ে তোলা ধূসর শিকড় দেখা যায়, জেন সাধক বোঝেন এ শিকড় শূন্যে চারিয়ে গিয়েছে, এ শিকড় সম্পূর্ণতায় বদ্ধমূল। এমন এক এক অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে এক একটি নতুন মুদ্রা, নতুন উপার্জন, তাই তাঁর কাছে পুরোনো অভিজ্ঞতার কোনো ভারাক্রান্ত সঞ্চয় নেই। জেন সাধক কোনো কিছুর দাম জানেন না, সব কিছুর মূল্য বোঝেন। বোধি তাঁর মূল্যবোধ পাল্‌টে দেয়, তাঁর এক জন্মে জন্মান্তর ঘটে। জেন নবজাতকের জয়ধ্বনি দেয়, জেন চিরজীবিতের জয় হোক বলে।

জেনবাদ একান্তভাবে চীনের সংস্কৃতির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। চীনের মানুষজনের ভিতর একটি মন আছে, সে হিশেবি, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, জেনের প্রখর সচেতনতার বোধের সঙ্গে সে মন বেশ খাপ খায়। চীনে মানুষ স্বভাবে সৌন্দর্যজাগর, তার এই নন্দনধর্মের অনেকটা জেন থেকে পাওয়া। জেনবাদ ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের মতো সুকোমল পুষ্পল অলঙ্করণ নয়, এ সটান মাটি আঁকড়ে থাকা একটা জ্যান্ত শক্তির কাজ। দুর্বোধ্য দীক্ষাপেক্ষ আচার, নিগূঢ় মণ্ডলকর্মের অনুষ্ঠান—ধর্মীয় প্রয়োগের দিক দিয়ে এসবও চীনের শিল্পকে প্রভাবিত করতে চেয়ে এসেছে বটে কিন্তু জেনের মতো এমন জোর এতখানি স্ফূর্তি তার আর কোনো মতবাদে নেই। চীনের দেওয়াল ভেঙে জেন একটা নতুন আয়তন খুলে দিল। চীনে শিল্পী ঢেউয়ের ছবি আঁকলেন, ফেনার চুড়োয় এসে ফেটে পড়লো শাদা কালোর শব্দ নিস্তব্ধ আঁচড়, এত তীব্র এমন বিব্রত রেখার আততি, অথচ কোথাও যেন কোনো চাপ নেই, যেন কোনো পৃষ্ঠটান নেই এই তরঙ্গের সৃষ্টিতে। সব বৈষম্য, সমস্ত বিশৃঙ্খলা, সমূহ সংক্ষোভ যেন একটি অবসানে মিশে গিয়েছে —উত্তরঙ্গ অথচ প্রশান্ত। জেন নশ্বরের অনুধ্যানে চিরন্তনের মূর্তি এনে দেয়, বচনে অনির্বচনীয়তার মাত্রা যোগ করে। জেন এমন এক চক্র যা চলে অথচ চলে না। চীনে শিল্পী এ কূটাভাসের মানে জানেন। তিনি বোঝেন উত্তাল ঝড়ের মাঝখানে চাইলে একটি স্তব্ধ কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বোঝেন ধূমাঙ্কিত শিখার মধ্যখানে একটি স্নিগ্ধতার বিন্দু আছে যেখানে দহনের অস্তিত্ব নেই। তিনি বোঝেন চোখের মণির কেন্দ্রে একটি স্থান আছে যা কিছুই দেখতে পায় না। জেনবাদী শিল্পীর সেই অন্ধকার চাই যা আলোর অধিক। জেনশিল্পী সেই কালো রং ব্যবহার করেন জলের অনুপাত অনুযায়ী যা নানান ছায়ে বর্ণাঢ্য। জেনশিল্পী সেই শূন্যতা ব্যবহার করেন যা কবিতা ও ছবিকে সম্পূর্ণতা দেয়।

উদ্যান জেনমঠের সংলগ্ন, জেনবাদীর কাছে নিসর্গ ও মানুষ পরস্পরে সংমিশ্রিত। তিনি জানেন একই রহস্য থেকে প্রকৃতি আর মানুষের উদ্ভব, প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে একই অনবশেষ ইন্দ্রিয়ময় অতীন্দ্রিয় বিস্তার। তাই চীনের চিত্রী যখন ছবি লেখেন কবিতা আঁকেন তখন তিনি প্রকৃতির বিপ্রতীপ কোণ তৈরি করেন না, তাঁর সৃষ্টি নিসর্গের সন্নিহিত কোণের নির্মাণ। চীনের শিল্পী বনানী আঁকেন, তারপর দর্শকের হাত ধরে তার ভিতর হারিয়ে যান। কখনো শাদা পটের উপর ঝুঁকে পড়েন, লহমায় শূন্যতা বর্ণিল ও রেখায়িত হয়ে ওঠে। দশক ভ'রে যে বাঁশঝাড়ের ছবি আঁকেন চীনা চিত্রকর সে বাঁশঝাড় বাঁশঝাড় নয়, রহস্যের প্রতীক নয়, ঘাসের নিকট প্রজাতি নয়, তা চিত্রকরের ক্রমিক হয়ে ওঠার ফসল, ধ্যানগত প্রেরণার প্রকাশ।

চীনা ছবিতে শাদা কালোর পাষাণভাঙা আর ফাঁকা জমি রেখে ভরাট ভাব নিয়ে আসার ব্যাপারটিও জেনপ্রভাবিত। জেনবাদীর কাছে শূন্য শূন্য নয়, তা দীপ্ত ব্যথাময় অস্তিত্ব, তা কাঠামোয় অনর্পিত। কথার মধ্যে যেমন যতিপাত, দুই স্তবকের মধ্যে যেমন ফাঁকা জায়গা, শূন্যবাদ তেমনি জেনসাধনার একটি মূল প্রত্যয়। চীন বিশ্বের কলাবিদ্যাকে শূন্যতার এই মহার্ঘ ধারণাটি উপহার দিয়েছে। কর্বুসিয়ে যখন বলেন যে স্থাপত্যে কংক্রিট নয়, আলো হাওয়াই আসলে দরকারি তখন মনে হয় এ কোনো খোলামেলা জেন সাধকের কথা শুনছি। মালার্মে যখন শব্দের সঙ্গে শব্দের বিয়ে দিয়ে সংগীত সৃষ্টি করতে চান তখন সেই সাংগীতিক স্থাপত্য জেন-বাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধরন কিন্তু সটান সরল মুক্ত, তা নমনীয় ছন্দে স্পন্দিত। জেনবাদী চৈনিক শিল্পীর কাজ কখনো বাস্তবের অবিকল অনুকৃতি নয়, তা প্রতীতির সর্বস্বতাও বলা যাবে না। এর মধ্যে আছে স্বতঃস্ফূর্তি ও বিস্তার, নির্ভার ও স্পষ্ট লঘুতা। প্রতিটি

তুষারকণার নিজস্ব নকশার মতো তাঁর প্রত্যেকটি কাজ—সম্পন্ন, সুন্দর, স্বতন্ত্র।

জেন জাপানেরও জাতীয় জীবনে মিশে গিয়েছে। জাপানি জীবনের যা সুরভি তার অনেকটাই জেনের নির্যাস। চীনের শিল্পকলার প্রবল উজ্জীবন ও প্রসার এখানে নেই, যা আছে কৃচ্ছ্রতা, সংযম ও সংহতি। জেন মঠের তোরণ থেকে এর যাত্রা শুরু, তোরণবিহীন তোরণে এর সমাপ্তি। জাপানি মানস গুণী কণ্ঠের মসৃণ ও নির্বাধ গানের মতো, শমে এসে কোথায় থামতে হয় তা তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। জাপানের জেন শিল্প যেন শিল্পী আর রসিকের মিলিত দোহার। শিল্পী ন্যূনতমের প্রকাশ ঘটান, রসিক তার চারপাশে নিবিড়তা ঘনিয়ে আনেন। জাপানের তীর চালানোয়, তলোয়ার খেলায়, ফুল সাজানোয়, চায়ের অনুষ্ঠানে—সবকিছুতেই জেন কাজে লাগে। জাপানের অতিরেকে অরুচি, রিক্ততার এই অহংকার, এই দারিদ্র্য জেনবাদের সংক্রমণ। একটি কথা জাপানি কবিতার নিশানা, একটি রেখা জাপানি ছবির দিশারি। এ সৃষ্টি নিকটজনের ভিড়ে একলা হয়ে বসার ইশারা। জাপানি শিল্পী রূপদক্ষতায় সাবলীল ; তাঁর রচনায় স্বেদগ্রন্থির উন্মোচন নেই, জননগ্রন্থির উদ্‌ঘাটন নেই, যা আছে তা শিল্পীর প্রায়-স্থগিত হয়ে ওঠা। এ যেন তুষারঢাকা বনের মাঝখানটিতে ফলের ভারে আনত একটা একলা চেরির গোছা—এত কাছে, এমন সুদূর। এত সহজ, এমন দুরূহ। জেনশিল্প নান্দনিক পরিশীলনের পরমতাকে স্পর্শ করে, তারপর ধুলোকাদায় ফিরে আসে। এ সূক্ষ্মতা গেইশার লাস্য নয়, এ সৌকুমার্য সামুরাইয়ের শৌর্যের প্রকাশ।

জেন কবিতা পাঠককে এক সম্পূর্ণ শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানে থরে থরে সাজানো আছে নির্জনতা, স্তব্ধতার অনুভব, দুঃখ, পিছুটান, হেমন্ত, ধ্বংসের চেতনা, রহস্য এবং এক অজানা দরজা, তা একই

সঙ্গে আবদ্ধ, উন্মুক্ত। এসব কবিতা ব্যাঙের লাফ দেওয়া পুরোনো পুকুরে নৈঃশব্দ্যের শব্দ তোলে। আর জেন গল্পও নিঃশব্দ এবং সহাস্য। জেনের তত্ত্ব অবতারণার চাইতে তা যেন ভালো কিছু। জেনবাদের যা প্রত্যয় তা এখানেও মিলবে। তাই এসব গল্প ধর্মীয় গল্প হয়েও স্পষ্ট ঋজু প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক পার্থিব এবং লোকায়ত। প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি এখানে নারী আর পুরুষের মতো এক আলিঙ্গনে বাঁধা, এ গল্পগুচ্ছ যেন এক সংযত দুর্ঘটনা। এর কোনো লক্ষ্য নেই তাই এর চলন এমন দ্রুত। এ সমস্ত গল্প পড়তে পড়তে জেন সাধকের পাগলাটে ভুঁড়িঅলা শয়তানিভরা ভবঘুরে চেহারা-খানা চোখে ভাসে, শূন্যতার একটা অন্য ধারণা তৈরি হয়। নিজেকে নিয়ে, নিজের ধর্ম নিয়েও যে হাসাহাসি করা যায় তা নতুন করে মনে পড়ে। জেন গল্পের আবোলতাবোল অনেক সময় অ্যাবসার্ড রচনার হ য ব র ল মনে করিয়ে দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ এক প্রাচীন ও অনন্য বর্ণপরিচয়। জেন-গল্প জেনমঠের চা অনুষ্ঠানের মতো, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম কর্কশ বিষণ্ণ রুক্ষ। দুতিনজন বন্ধু অব্যস্ত সচেতনতায় চিনেমাটির চায়ের বাটি ঘিরে বসেন, একটু তিতকুটে বেশ সুগন্ধি সবুজ চায়ের পাতা গরম জলে তলিয়ে গিয়ে স্পষ্ট হয়, তরল জেডের রং ধরে, একই সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আর কাজ শুরু করার এই পূর্বমুহূর্ত—ঘড়িতে সময়বিহীন সময়ের প্রতিধ্বনি লক্ষ্যহীন বেজে যায়। আসুন, আমরা এখন জেন গল্প শুরু করি।

মার্কিন চায়না টাউনগুলিতে ঘুরে ফিরে বেড়ালে প্রায়ই এক সমর্থ চিনেপুরুষের মূর্তি দেখা যায়, সে একটি শনের বস্তা বহনরত। চিনে বণিকরা তাকে সুখী চিনেম্যান বা সহাস্য বুদ্ধ বলে থাকে।

ইনি তাঙ্ যুগের মানুষ। নিজেকে জেন আচার্য প্রতিপন্ন করার কোনো ইচ্ছে তাঁর ছিল না। চারদিকে শিষ্য জড়ো করতেও তিনি চাননি। তার বদলে তিনি একটি বড়ো থলি বয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেই থলির মধ্যে থাকতো ফল মিষ্টি প্রভৃতি উপহার। পথে তাঁর চারপাশে ঘনিয়ে আসা শিশুদের তিনি খেলার ছলে এইসব উপহার দিতেন। এভাবে তিনি পথেই কিন্ডারগার্টেন খুলে বসেছিলেন।

যখনি কোনো জেন-ভক্তের সঙ্গে দেখা হতো তিনি হাত বাড়িয়ে বলতেন : আমাকে একটি পয়সা দিন। আর কেউ যদি তাঁকে মন্দিরে গিয়ে জেন শেখানোর কথা বলতেন তাহলেও তিনি উত্তর দিতেন : আমাকে একটি পয়সা দিন।

একবার তিনি যখন খেলার কাজে মত্ত তখন আরেকজন জেন আচার্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আচার্য জানতে চাইলেন : 'জেন-এর তাৎপর্য কী?'

তিনি তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ উত্তরের মতো থলি মাটিতে নামিয়ে রাখলেন।

আচার্য আবার জিজ্ঞাসা করলেন : 'তা হলে জেন-এর প্রয়োগ কী ?'

সুখী চিনেম্যান তখনই কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে পথে এগিয়ে চললেন।

বুদ্ধ

মেইজি যুগের তোকিয়োয় দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আচার্য ছিলেন। একজনের নাম আন্‌-শো, তিনি শিনগনের শিক্ষক, তিনি নিষ্ঠাভরে বুদ্ধের বিধান পালন করতেন। তিনি মদ্যপান করতেন না, দ্বিপ্রহরের পরে আহার করতেন না। অন্যজন তানজান, তিনি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, কোনো বিধিবিধান মানতেন না। যখন খেতে ইচ্ছে হতো খেতেন, শোয়ার ইচ্ছে হলে দিবানিদ্রা দিতেন। একদিন আন শো তানজানের কাছে গেলেন। তানজান মদ খাচ্ছিলেন, যাতে নাকি একজন বুদ্ধবাদীর ঠোঁট ভেজানোও উচিত নয়।

তানজান তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন : 'কী ভায়া। চলবে নাকি এক পাত্তর ?'

'আমি কখনো পান করি না।' আনশো সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্যসহকারে বললেন।

'যে মদ খায় না সে মানুষই নয় !' তানজান বললেন।

'মদ্য পানের বদ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিই না বলে আপনি

আমাকে অমানুষ বললেন।' আনশো রীতিমতো ক্ষিপ্ত। 'আমি যদি মানুষ না হই তা হলে আমি কী?

'বুদ্ধ'। তানজানের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কাদা রাস্তা

একদা তানজান এবং ইকিদো একসঙ্গে এক কর্দমাক্ত পথ ধরে চলছিলেন। তখনও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে।

একটি বাঁকের মুখে এসে তাঁরা এক সুন্দরী তরুণীকে দেখলেন। রেশমের কিমানো আর ঝালরসমেত তরুণীটি জলধারা পার হতে পারছিলেন না।

আসুন, তানজান তখনই বললেন। দুবাহু দিয়ে তরুণীটিকে তুলে নিয়ে তাঁকে বহন করে কাদাজল পার করে দিলেন।

সে রাত্রের মতো এক মন্দিরে পৌঁছানো পর্যন্ত ইকিদো আর কোনো কথা বললেন না। শেষে তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তানজানকে বললেন: 'আমরা সাধুপুরুষরা মহিলাদের কাছে যাই না। বিশেষ করে তাঁরা যদি সুন্দরী এবং যুবতী হন। যাওয়াটা বিপজ্জনক। আপনি কেন ওরকম করলেন?'

তানজান উত্তর দিলেন: 'আমি তো যুবতীটিকে তখনই সেখানে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনি কি যুবতীটিকে এখনো বহন করে চলেছেন?'

শাউন জেন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর বুড়ো মাকে দেখা শোনা করতে হতো।

শাউন ধ্যানঘরে গেলে মাকে নিয়ে যেতেন। মঠে গেলেও সাধুদের সঙ্গে তাঁর থেকে যাওয়া ঘটতো না, মা সঙ্গে থাকতেন। শাউন তাই একটি ছোটো ঘর বেঁধে মাকে যত্নে রাখলেন। তিনি সূত্র বুদ্ধবাদী কবিতা প্রভৃতির প্রতিলিপি প্রস্তুত করতেন এবং তার বিনিময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী যৎসামান্য পেতেন।

শাউন যখন মায়ের জন্য মাছ কিনতেন তখন লোকজন তাঁকে নিয়ে মজা করতো, কারণ সাধুদের নাকি মাছ খেতে নেই। শাউন তাতে কিছু মনে করতেন না। সকলে তাঁর ছেলেকে উপহাস করছে দেখে শাউনের মা মনে দুঃখ পেলেন। বললেন: 'আমি সাধিকা হয়ে যাবো। আর আমি নিরামিষাশী হতেও পারবো।' তিনি তাই করলেন। তারপর থেকে তাঁরা দুজনে শাস্ত্র অভ্যাস করতেন।

শাউন সংগীতপ্রিয় ছিলেন, বীণাবাদনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর মাও বীণা বাজাতে পারতেন। পূর্ণচন্দ্রের রাত্রে তাঁরা দুটিতে একসঙ্গে বাজাতেন। এমনই এক রাতে সে পথ দিয়ে যেতে যেতে এক তরুণী সেই মূর্ছনা শুনলেন। সে সুর তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করলো। পরের সন্ধ্যায় তাঁর আবাসে গিয়ে বাজানোর জন্য তিনি শাউনকে আমন্ত্রণ জানালেন। শাউন কদিন বাদে পথে

নেমে আসা মহিলাটিকে দেখতে পেয়ে তাঁর আতিথেয়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। সকলে আবার তাঁকে উপহাস করলো। কারণ তিনি রাস্তার মেয়ের ঘরে উঠেছিলেন।

একদিন শাউন উপদেশ দিতে দূরের এক মন্দিরে গেলেন। কয়েকমাস পরে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর মা মৃত। বন্ধুরা জানতেন না শাউনকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, তাই তখন শেষকৃত্যের কাজ এগিয়ে চলেছিল।

শাউন এগিয়ে গিয়ে তাঁর দণ্ডটি দিয়ে শবাধারে আঘাত কবলেন। বললেন : 'মা, আপনার সন্তান ফিরে এসেছে।'

'বাছা, ফিরেছো দেখে আমি খুশী হয়েছি।' মায়ের হয়ে শাউন উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ আমিও খুশি।' শাউন এবার নিজের জবাব দিলেন। তারপর কাছাকাছি লোকজনকে ডেকে বললেন : 'শেষকৃত্য সমাধা হয়েছে। এবার আপনারা দেহটি সমাধিস্থ করতে পারেন।'

শুনকাইয়ের গল্প

অপূর্ব সুন্দর মেয়ে শুনকাই অল্প বয়সে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিয়ের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দর্শনের পাঠ নিতে শুরু করেন।

শুনকাইকে দেখা মানে তাঁর প্রেমে পড়া। তাছাড়া যেখানে যেতেন শুনকাই নিজেও কারো না কারো প্রেমে পড়তেন। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের দিনগুলিতে এবং তার পরেও যখন দর্শন তাঁকে শান্তি দিতে পারছে না দেখে তিনি জেন মন্দিরের দ্বারস্থ, তখনও প্রেম তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না। জেনসতীর্থরা তাঁর প্রেমে পড়লেন। মনে হলো শুনকাইয়ের সারা জীবন প্রেমে সম্পৃক্ত।

শেষে কিয়োতোয় এসে তিনি একজন প্রকৃত জেন-ছাত্রী হয়ে উঠলেন। মন্দিরের সব সতীর্থ তাঁর নিষ্ঠার প্রশংসা করতেন। তাঁদের মধ্যে উদারহৃদয় এক তরুণ তাঁকে ধর্মদেশনায় সাহায্য করতেন।

কেননিন মঠের অধ্যক্ষ মোকুরাই বা স্তব্ধবজ্র কঠিন মানুষ। তিনি নিজে বিধি বিধান মানতেন, তাঁর পুরোহিতদেরও মানতে বাধ্য করতেন। তাঁর মন্দিবগুলিতে মেয়ে দেখলেই মোকুরাই ঝাঁটাহস্তে তেড়ে যেতেন। কিন্তু যত ঝেঁটিয়ে সাফ করুন না কেন বুদ্ধবাদী সব মন্দিরে স্ত্রীলোকেরা আরো বেশি ভিড় করে আসতেন।

ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতেব স্ত্রী শুনকাইয়ের নিষ্ঠা আর সৌন্দর্যকে ঈর্ষা করতেন। সাধকরা শুনকাইয়ের সপ্রশংস উল্লেখ করতে থাকলে তিনি হিংসায় জ্বলে পুড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি শুনকাই আর তাঁর সেই তরুণ বন্ধুটির নামে কলঙ্ক রটিয়ে দিলেন। ফলে তরুণটিকে বিতাড়িত করা হলো, শুনকাইও মঠ থেকে নির্বাসিত হলেন।

শুনকাই ভাবলেন : প্রেম করে আমি ভুল করে থাকতে পারি কিন্তু তরুণ বন্ধুটির উপর এমন অবিচারের পর পুরোহিতের স্ত্রীকে আর মন্দিরে থাকতে দেওয়া যায় না। এই ভেবে ঐ রাত্রে শুনকাই

একপাত্র কেরোসিন নিয়ে আগুন ধরিয়ে পাঁচশো বছরের প্রাচীন ঐ মন্দিরটিকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন। ভোরে রাজপ্রহরীদের কাছে শুনকাই নিজেকে সমর্পণ করলেন।

এক উকিল যুবক তাঁর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে তাঁর গুরুদণ্ড লঘু করতে চাইলেন। শুনকাই বললেন: 'আমাকে সাহায্য করবেন না। আমি আবার অন্য এমন কিছু করার কথা ভেবে বসতে পারি যাতে আমাকে জেলেই যেতে হয়।'

সাত বছরের কারাদণ্ড শেষ হলে পর শুনকাই যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন তখন জেলের তেষট্টি বছরের বুড়ো প্রহরীও তাঁর প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু এখন সকলে শুনকাইকে দাগী আসামীরূপে দেখছিলেন। এমন কী তথাকথিত মুক্তমনের জেনবাদীরাও তাঁকে এড়িয়ে চলছিলেন। শুনকাই বুঝলেন জেনবাদ এক কথা আর জেনবাদী আর এক। শুনকাইকে নিয়ে আত্মীয়দেরও আর কিছু করার রইলো না। তিনি রুগ্‌ণ, দরিদ্র আর দুর্বল হয়ে পড়লেন।

এ সময় তিনি শিনশু সম্প্রদায়ের এক পুরোহিতের দর্শন পেলেন। পুরোহিতের কাছে শেখা প্রেমময় বুদ্ধের নাম শুনকাইয়ের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দিল। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলো, অনতিতিরিশ শুনকাই তখনও অপূর্ব সুন্দর।

নিজের জীবন নির্বাহের জন্য শুনকাই তাঁর আত্মকথা রচনার এক ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন এবং এক লিপিকারিণীকে দিয়ে তার কিয়দংশ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এভাবে তা জাপানি মানুষের

হাতে এসে পৌঁছেছিল যাঁরা শুনকাইকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন, তাঁর কলঙ্ক রটনাও করেছিলেন, তাঁরা আজ সাশ্রু চোখে শুনকাইয়ের অসমাপ্ত আত্মকথা পড়ে থাকেন।

বুদ্ধত্ব

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র গাসানকে দর্শন করতে এসে বললেন : আচ্ছা, আপনি কী কখনো কৃশ্চান বাইবেল পড়েছেন ?'

গাসান বললেন : 'না। আপনি আমায় পড়ে শোনান।'

ছাত্রটি বাইবেল খুলে মথিলিখিত সুসমাচারের অংশ পড়লেন : আর বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তিত হও কেন ? মাঠের ফুলের বিষয়ে ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেমন করিয়া বড় হয় ; তাহারা শ্রম করে না, সুতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদের বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহাদের একটির ন্যায় সজ্জিত ছিলেন না। ...অতএব তোমরা কল্যকার নিমিত্ত চিন্তিত হইও না, কারণ কল্যের চিন্তা কল্যেরই হইবে।

গাসান বললেন : 'একথা যিনিই বলে থাকুন আমার বিবেচনায় তিনি বোধি লাভ করেছেন।'

ছাত্রটি পড়ে চললেন : যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হইবে ; অন্বেষণ কর, পাইবে ; দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ যে কেহ যাচনা করে সে গ্রহণ করে ; যে অন্বেষণ করে সে পায় ; যে দ্বারে করাঘাত করে তাহার জন্য খুলিয়া

দেওয়া হইবে।

গাসান মন্তব্য করলেন : 'চমৎকার। যিনিই একথা বলে থাকুন তিনি বুদ্ধত্ব থেকে বেশি দূরে নয়।'

কৃপণ শিক্ষা

কুসুদা নামে তোকিয়োর এক তরুণ ডাক্তার জেন-শিক্ষারত এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে জেন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বন্ধুটি বললেন : 'জেন কী আমি বলতে পারবো না। তবে একটা কথা ঠিক। আপনি জেন জানলে মরতে ভয় পাবেন না।' কুসুদা বললেন : 'সে তো খুব ভালো। শিখবো তা হলে। কিন্তু, শিক্ষক কোথায়?' বন্ধুটি তখন তাঁকে নান-ইনের কাছে যেতে বললেন।

শিক্ষক নিজে মরতে ভয় পান কিনা তা জানবার জন্য কুসুদা সাড়ে নয় ইঞ্চির একটা ছুরি নিয়ে নান-ইনের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে গেলেন।

তাঁকে দেখেই নান-ইন বলে উঠলেন : 'এই যে বন্ধু, আসুন। তারপর বলুন, আছেন কেমন। অনেকদিন দেখা হয় না আপনার সঙ্গে।' শুনে কুসুদা খুব অবাক হয়ে বললেন : 'আমাদের আগে কখনো দেখা হয়নি তো'। নান-ইন উত্তর দিলেন : 'ঠিকই। আসলে এখানে শিখছেন এমন এক ডাক্তারের সঙ্গে আমি আপনাকে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।' এভাবে শুরু হওয়ায় ডাক্তারের আর শিক্ষককে পরীক্ষা করা হলো না, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে তিনি তখন

জেন শেখার কথা পাড়লেন।

নান-ইন বললেন : 'জেন কঠিন কাজ নয়। আপনি ডাক্তার, রোগীদের সহৃদয়ভাবে দেখবেন। সেটাই জেন।' কুসুদা তিনবার নান-ইনের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রতিবার নান-ইন এই এক কথা বললেন : 'ডাক্তারের এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আপনি বাড়ী যান, রোগীদের যত্ন নিন।'

কুসুদা বুঝলেন না এ শিক্ষা মৃত্যুভয় দূর করবে কীভাবে। চারবারের বার গিয়ে তিনি সেটা বলেই ফেললেন। আরো বললেন, এই যদি জেন হয় তা হলে তিনি আর নান-ইনের কাছে আসবেন না। নান-ইন তখন কুসুদাকে একটি সমস্যা পূরণ করতে দিলেন। এক বছরে হলো না, দেড় বছর লাগলো কুসুদার সে সমস্যার সমাধান করতে। তারপর কুসুদার সমস্যা মিটলো। মন শান্ত হলো। কোনো-কিছু-না সত্য রূপে প্রতিভাত হলো। তিনি রোগীদের সুচিকিৎসা করতে লাগলেন। কুসুদা না জেনেই জীবন আর মৃত্যু ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন।

তারপর নান-ইনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আচার্য খালি হাসলেন।

এক পাত্র চা

নান-ইন নামে এক জাপানি সাধকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক জেন সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছিলেন।

নান-ইন্ চা পরিবেশন করছিলেন। তিনি তাঁর অতিথির চা-পাত্র পূর্ণ ক'রে চা ঢেলে দিলেন এবং আরো ঢালতে থাকলেন।

অধ্যাপকটি ঐ উপছে-ওঠা লক্ষ করছিলেন। শেষে নিজেকে আর সংবরণ না করতে পেরে বললেন: 'অতিরিক্ত ভ'রে গিয়েছে। পাত্রটিতে আর ধরবে না।'

নান-ইন বললেন: 'এই পাত্রটির মতো আপনিও আপনার নিজের মতামতে পরিপূর্ণ। আগে আপনার পাত্র শূন্য না করলে আমি কী ভাবে আপনাকে জেন দেখাবো?'

উলুবনে মুক্তো

সম্রাটের শিক্ষক গুদো ছিলেন এক রমতা সাধু। তিনি এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তাকেনাকা নামে এক ছোটো গ্রামে এলেন। তাঁর ঘাসের চটি ফেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেখানে এক খামার বাড়ির জানালায় চার পাঁচ জোড়া চটি সাজানো দেখে তিনি ভাবলেন এক জোড়া কিনবেন।

খামার বাড়ির মহিলাটি তাঁকে চটি বিক্রি করলেন। সাধুর কাকভেজা অবস্থা দেখে তাঁকে রাত্রিবাসের নিমন্ত্রণও জানালেন। ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ঢুকে গুদো ক্রমে বুঝলেন পরিবারটির খুব দীন দশা। কারণ দেখিয়ে মহিলাটি বললেন যে, বাড়ির কর্তা সব টাকা মদ জুয়োয় উড়িয়ে দেন। তাই তাঁরা এত অসহায়।

গুদো বললেন: 'আমি আপনার স্বামীকে সাহায্য করবো।

আপনি এই টাকা নিয়ে আমাকে এক জালা ভালো মদ কিছু ভালো খাবারও আনিয়ে দিন। তারপর গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি এই পারিবারিক স্তূপটির সামনে ধ্যান করবো।'

মাঝ রাত্রে বাড়ির কর্তা মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে খাবার দিতে হাঁক পাড়লেন। গুদো বললেন : 'আমার কিছু দেবার আছে। বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলাম তাই আপনার স্ত্রী দয়া করে আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন। তার বদলে আমি কিছু মদ আর মাছ কিনে এনেছি। আপনি এসব খেতে পারেন।' মানুষটি ভারি খুশি। আবার মদে টইটম্বুর হয়ে কর্তাটি মেজেতে গড়িয়ে পড়লেন। গুদো তার পাশে ধ্যানে বসলেন।

ভোরে কর্তা যখন জেগে উঠেছেন গত রাতের কথা তাঁর আর কিছু মনে নেই। ধ্যানরত সাধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?' জেন সাধক উত্তর দিলেন : 'আমি কিয়োতোর গুদো, এদো নগরে চলেছি।' শুনে মানুষটি অত্যন্ত লজ্জা পেলেন। সম্রাটের শিক্ষকের কাছ থেকে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। গুদো হেসে বললেন : 'জীবন ক্ষণস্থায়ী। মদ খেলে আর জুয়া খেললে এ জীবনে আর কিছু করার থাকে না। আর এতে পরিবারকেও কষ্ট দেওয়া হয়।'

স্বামীটি যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। ঘোষণা করলেন : 'যথার্থ বলেছেন আপনি। এ আশ্চর্য শিক্ষার ঋণ আমি কী পরিশোধ করতে পারি। আপনার ব্যবহার্য বস্তুগুলি আমি কিছু দূর পর্যন্ত বহন করবো।' গুদো সম্মত হলেন।

দুজনের যাত্রা শুরু হলো। এক ক্রোশ যাবার পর গুদো তাঁকে ফিরতে বললেন। 'আর মাত্র তিন ক্রোশ।' মিনতি করলেন মানুষটি। অগ্রসর হয়ে চললেন তাঁরা।

'এখন ফিরতে পারেন।' গুদো প্রস্তাব দিলেন।

'আর পাঁচ ক্রোশ পরে ফিরবো।'

পাঁচ ক্রোশ পার হয়ে গুদো বললেন : 'এবার ফিরুন।'

মানুষটি বললেন : 'আমি আমার বাকি জীবন আপনার অনুসরণ করে যাবো।'

জাপানের আধুনিক জেন শিক্ষকরা এই সাধুর ধারা বেয়ে এসেছেন। আর যে মানুষটি কখনো ফেরেন নি তাঁর নাম মু-নান।

তাই কী

শুদ্ধ জীবন যাপনের জন্য জেন সাধক হাকুইন তাঁর প্রতিবেশীদের প্রশংসা পেতেন।

হাকুইনের কাছে থাকতেন এক জাপানি খাবারের দোকানি আর তাঁর সুন্দর এক মেয়ে ছিল। একদিন হঠাৎই তার অভিভাবকেরা আবিষ্কার করলেন মেয়েটি গর্ভবতী।

বাবা মা ক্রুদ্ধ। মেয়ে কিছুতেই স্বীকার করবে না লোকটি কে। অবশেষে অনেক তাড়নার পর সে হাকুইনের নাম বললো।

অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে অভিভাবকেরা সাধকের কাছে গেলেন। হাকুইন শুধু বললেন : 'তাই কী?'

শিশুটির জন্ম হলে তাকে হাকুইনের কাছে নিয়ে আসা হলো। ততদিনে হাকুইনের খ্যাতি নষ্ট হয়েছে, অবশ্য তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নি। তিনি যত্নে শিশুটিকে লালন করতে থাকলেন। তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দুধ ও শিশুটির প্রয়োজনীয় অন্য সব কিছুও সংগ্রহ করতেন।

এক বছর হয়ে গেলে কুমারী মা-টি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অভিভাবকদের সত্য বললেন। বললেন যে মাছ-বাজারের একটি যুবক শিশুটির প্রকৃত জনক।

মেয়েটির মা বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাকুইনের কাছে প্রভূত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে গেলেন।

হাকুইন সম্মত ছিলেন। শিশুটিকে প্রত্যর্পণ ক'রে তিনি শুধু বললেন: 'তাই কী?'

আনুগত্য

সাধক বানকেইয়ের কথা শুনতে শুধু জেনবাদী ছাত্ররা নন সব শ্রেণীর সব ধরনের লোকেরাও আসতেন। বানকেই কখনো সূত্র উদ্ধৃত করতেন না আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বেরও অবতারণা করতেন না। তাঁর কথা সরাসরি তাঁর হৃদয় থেকে শ্রোতাদের হৃদয়ে চলে যেত।

তাঁর শ্রোতাদের বিপুল সংখ্যা দেখে নিচিরেন সম্প্রদায়ের এক পুরোহিত খুব ক্ষুব্ধ। তাঁর দলবলও জেন সম্পর্কে শুনতে আসে। আত্মকেন্দ্রিক নিচিরেন পুরোহিতটি মন্দিরে এলেন। বানকেইয়ের

সঙ্গে বিতণ্ডা বাধাতে তিনি বদ্ধপরিকর।

তিনি চিৎকার করে বললেন: 'ওহে জেন শিক্ষক। থামুন, থামুন। যাঁদের কাছে আপনি শ্রদ্ধেয় তাঁরা আপনার কথা শুনবেন। আমি সেরকম নয়। আপনি আমাকে আপনার অনুগত করে তুলতে পারবেন?'

'আমার পাশে আসুন, দেখবেন।' বানকেই একথা বললেন।

অহংকারী পুরোহিত ভিড় ঠেলে সাধকের কাছে গেলেন। বানকেই হাসলেন। 'আমার বাঁদিকে আসুন।' পুরোহিত তাই করলেন।

বানকেই বললেন: 'না, বাঁদিকে নয়। আপনি ডানদিকে এলে আমরা আরো ভালো ভাবে কথা বলতে পারবো। এদিকে আসুন।'

পুরোহিত গর্বিত পদক্ষেপে ডানদিকে সরে গেলেন। 'দেখছেন তো।' বানকেই বললেন: 'আপনি আমাকে মেনে চলছেন। আমার মনে হয় আপনি একজন অতি ভদ্রসন্তান। এবার বসে পড়ুন আর শুনুন।'

মুক্ত প্রেম

বিশজন সাধক আর একজন সাধিকা। সাধিকার নাম এশুন। এক জেন সাধকের কাছে তাঁরা সকলে ধ্যান অভ্যাস করতেন।

এশুন মাথা-মুড়োনো, শাদাশিধে পোশাক পরা, তবু আশ্চর্য সুন্দর। কয়েকজন সাধক গোপনে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন।

একলা দেখা করতে চেয়ে তাঁদের একজন এশুনকে একটি প্রেমপত্রও লিখে ফেললেন।

এশুন উত্তর দিলেন না। পরদিন শিক্ষক গোটা দলটিকে পাঠ দিচ্ছিলেন। পাঠ শেষ হলে এশুন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রেমপত্র লেখককে উদ্দেশ্য করে বললেন: 'এমনই যদি সত্যই আমাকে ভালোবাসেন তা হলে আসুন আর আমাকে আলিঙ্গন করুন।'

ঘোষণা

তাঁর জীবনের শেষ দিনে তানজান ষাটটি চিঠি লিখে ফেলে তাঁর এক অনুচরকে ডেকে চিঠিগুলি ডাকে দিয়ে আসতে বললেন। তারপর তিনি প্রয়াণ করলেন।

চিঠিগুলিতে লেখা ছিল:

ছেড়ে যাই এ পৃথিবী।
এ আমার শেষ কথা।

তানজান
২৭ জুলাই ১৮৯২

মহোর্মি

মেইজি যুগের গোড়ার দিকে নামকরা একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর নাম ও-নামি, যার মানে বিশাল ঢেউ।

ও-নামি বিরাট শক্তিশালী ছিলেন, মল্লবিদ্যাও জানতেন।

নির্জনে তিনি গুরুকে পরাভূত করতেন, কিন্তু জনসমক্ষে তাঁর এমন লজ্জা লাগতো যে তাঁরই ছাত্রেরা তাঁকে পদানত করতো।

ও-নামি একজন জেন শিক্ষকের সাহায্য নেবেন ভাবলেন। সাধু হাকুজু তখন কাছেই একটি মন্দিরে ছিলেন। ও-নামি তাঁর কাছে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বললেন।

সাধু বললেন : 'এই মন্দিরে এ রাতটা থাকুন। আপনার নাম ও-নামি। আপনি নিজেকে বিরাট ঢেউ ব'লে কল্পনা করুন। আপনি আর ভীরু কোনো মল্লযোদ্ধা নন। আপনি সেই বিশাল ঢেউ যা সবকিছু ভাসিয়ে দেয়, যা সবকিছু ডুবিয়ে দেয়। এরকম ভাবুন, দেখবেন আপনি এ দেশের সেরা মল্লযোদ্ধা হয়ে উঠেছেন।'

সাধু চলে গেলেন। ও-নামি ধ্যানে বসলেন, ঢেউ ভাবতে চাইলেন নিজেকে। নানা কিছুর ভাবনা তাঁর মাথায় এলো। ক্রমশ শেষে তিনি উত্তরোত্তর নিজেকে ঢেউ ভাবতে পারলেন। রাত যত বাড়লো, ঢেউয়ের পরে ঢেউও তত বড়ো আরো বড়ো হলো। ফুলদানি ভাসিয়ে দিল সে ঢেউ। এমনকি বুদ্ধের স্তূপটিকেও প্লাবিত করলো। প্রত্যূষে মন্দির অসীম তরঙ্গের জোয়ার ভাটা হয়ে গেল।

সকালে এসে সাধু দেখলেন ও-নামি তখনও ধ্যানমগ্ন, তাঁর মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা। তিনি মল্লযোদ্ধার কাঁধে আলতো চাপড় দিলেন, বললেন : 'আর কোনো কিছুই আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আপনি ঐ ঢেউ। আপনার সামনের সবকিছু আপনি ডুবিয়ে দেবেন।'

সেদিনই ও-নামি মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় নাম দিলেন, জিতলেন। তারপরে জাপানে আর কেউ তাঁকে হারাতে পারেনি।

চন্দ্র

জেন সাধক রিওকান এক পাহাড়ের তলায় খুব শাদাশিধে থাকতেন। রাত্রে এক চোর এসে দেখল তাঁর কুঁড়েয় চুরির মতো কিছুই নেই।

রিওকান চোর ধরলেন। বললেন: 'আপনি হয় তো বহুদূর থেকে আমার কাছে এসেছেন। আপনার শূন্য হাতে ফেরা ঠিক নয়। আপনি আমার এই পোশাক উপহার নিন।'

অবাক চোর পোশাক নিয়ে সরে পড়লো।

রিওকান নগ্ন, বসে চন্দ্র দেখছিলেন। ভাবলেন: আহা, বেচারাকে যদি এই সুন্দর চাঁদ দিতে পারতাম।

অন্ত্যমিল

অনেক দিন চীনে কাটিয়ে জেন সাধক হোশিন ফিরে এসে তাঁর জাপানি শিষ্যদের উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি ক্রমশ বুড়ো হয়ে পড়ছেন দেখে চীনে-শোনা একটি গল্প শিষ্যদের বললেন—

একবার বড়োদিনে বুড়ো তোকুফু তাঁর শিষ্যদের বললেন:

‘এ বছরটা যত পারো আমার যত্ন করে নাও। সামনের বছর অবধি আর বাঁচবো না।’

শিষ্যরা ভেবেছিল তিনি তো মজা করছেন। তবে লোক তিনি বড়ো ভালো, শিষ্যেরা পালা করে তাই বছরের বাকি কটা দিন তাঁর বিশেষ পরিচর্যা করলো।

বছরের শেষ সন্ধ্যায় তোকুফু শেষ কথা বললেন : ‘ভালোই করলে তোমরা। কাল বিকেলে তুষার পড়া থেমে গেলে আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো।’

শিষ্যরা হাসলো, ভাবলো বুড়ো ভুল বকছেন। পরিষ্কার, তুষার-হীন ছিল সেই রাত্রি। মধ্যরাত থেকে তুষারপাত শুরু হলো, পরদিন শিষ্যরা গুরুকে খুঁজে পেল না। তাঁর ধ্যানঘরে গেল। দেখলো, তোকুফু প্রয়াণ করেছেন।

গল্পটি ক’রে হোশিন বললেন : ‘শেষ দিনের কথা যে বলে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। তবে জেন সাধক যদি তা চান বলতেই পারেন।’

‘আপনি পারেন?’ কে একজন বললো।

‘হ্যাঁ। আমি বলছি, সাতদিনের মধ্যেই।’

তাঁর কথা শিষ্যরা বিশ্বাস করলো না। পরের বার তিনি যখন শিষ্যদের কাছে ডাকলেন তখন তাদের অনেকেই ও কথা ভুলে গেছে।

হোশিন বললেন : ‘সাত দিন আগে আমি বলেছি, আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি। আমি কবি না, লিখিয়েও না, কিন্তু

যথারীতি একটি বিদায়ের কবিতা লিখে যেতে হবে। আমার শেষ কথা তোমরা কেউ লিখে নাও।'

তাঁর শিষ্যরা ভাবলে গুরু রঙ্গ করছেন। একজন অবশ্য লিখতে শুরু করলো।

'প্রস্তুত?' গুরু জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, মশাই।'

তখন হোশিন শ্রুতিলিখন দিলেন:

প্রভাস্বর থেকে আমি আসি,
আর ফিরে যাই প্রভাস্বরে।
এ সব কী?

গতানুগতিক চার পংক্তির কবিতা, তাই শিষ্যটি বললো: 'গুরুদেব। আমাদের এক পংক্তি কম পড়ছে।'

হোশিন অধিকারী সিংহের মতো গর্জন করলেন: 'কা'। অর্থাৎ: হা হা ক'রে উচ্চরোল হাসি। তখন তাঁর প্রয়াণ ঘটলো।

ধর্মদেশনা

বুদ্ধ একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলেছিলেন:

বনে যেতে গিয়ে একটা লোক বাঘের মুখে পড়লো। ছুটলো লোকটা, বাঘটা তার পেছনে। ছুটতে ছুটতে একটা খাড়াই টিলায় এলো, হাতের কাছে একটা বুনো আঙুরের শেকড় পেয়ে তাই ধরে ঝুলে পড়ল কিনারায়। ওপরে বাঘটা গরগর করছে। ভয়ে

লোকটা নিচে তাকাল, তলায় খাদে আরেকটা বাঘ তার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।

এদিকে দুটো ইঁদুর, তাদের একটা শাদা আর একটা কালো, তারা ঐ আঙুরের শেকড় একটু একটু করে কাটতে শুরু করেছে। এমন সময় লোকটা কাছেই একটা টসটসে জাম দেখতে পেল। এক হাতে আঙ্গুরের শেকড় ধরে, আরেক হাতে সে জামটা পাড়লো। কী মিষ্টি যে লাগলো জামটা।

প্রথম সূত্র

কিয়োতোর ওবাকু মন্দিরে গেলে দেখা যাবে তোরণে 'প্রথম সূত্র' কথাটি খোদাই করা আছে। সব অক্ষর খুব বড়ো বড়ো আর যাঁরা অক্ষরাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা সকলে এটিকে একবাক্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করবেন। দুশো বছর আগে কোসেন এই অক্ষর চিত্রণ করেছিলেন।

কর্মীরা কাঠে বড় বড় করে পরে খোদাই করবেন তাই কোসেন আগে এই অক্ষর কাগজে আঁকছিলেন। চিত্রলিপিটি করার সময় কোসেনের সঙ্গে ছিল এক সাহসী ছাত্র। ছাত্রটি আঁকার কালি প্রস্তুত করেছিলো এবং সবসময় শিক্ষক কোসেনের কাজের সমালোচনা করতেও প্রস্তুত ছিল।

'ওটা ভালো হয়নি।' প্রথম প্রয়াসের পর ছাত্রটি কোসেনকে একথা বলল।

'এটা?'

'বাজে। আগের চেয়েও খারাপ।' ছাত্রটি স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করলো।

ধীর সহিষ্ণুতায় কোসেন একের পর এক এঁকে চললেন, চুরাশিটি 'প্রথম সূত্র' স্তূপ হয়ে উঠলো, অথচ কোসেন তখনও ছাত্রটির সম্মতি পেলেন না।

তারপর তরুণ ছাত্রটি তখন অল্প কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছে। কোসেন ভাবলেন : এই আমার ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ। লহমায় আঁকলেন তিনি, তাঁর বিনির্মুক্ত মন কাজ করলো : 'প্রথম সূত্র।'

'সেরা কাজ এটি।' ছাত্রটি স্পষ্ট করে বলল।

মায়ের কথা

আচার্য জিউন তোকুগাওয়া যুগের এক সুপরিচিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সতীর্থদের পাঠ দিতেন। তাঁর মা একথা জেনে তাঁকে একটি পত্র লিখেছিলেন :

বৎস, আমার বোধ হয় না তুমি একজন বৌদ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছ। কারণ অন্যদের কাছে তুমি জীবন্ত অভিধান স্বরূপ হয়ে উঠতে চাও। তথ্য এবং ভাষ্যের সম্মান এবং গৌরবের শেষ নেই। আমার ইচ্ছা তুমি এই বিদ্যাদান ব্যবসায় ত্যাগ করো। সুদূর কোনো পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র কোনো মন্দিরে নিজেকে সংবৃত করো। ধ্যানে মনোনিবেশ করো এবং এভাবে তুমি যথার্থ বোধি লাভ করতে পারবে।
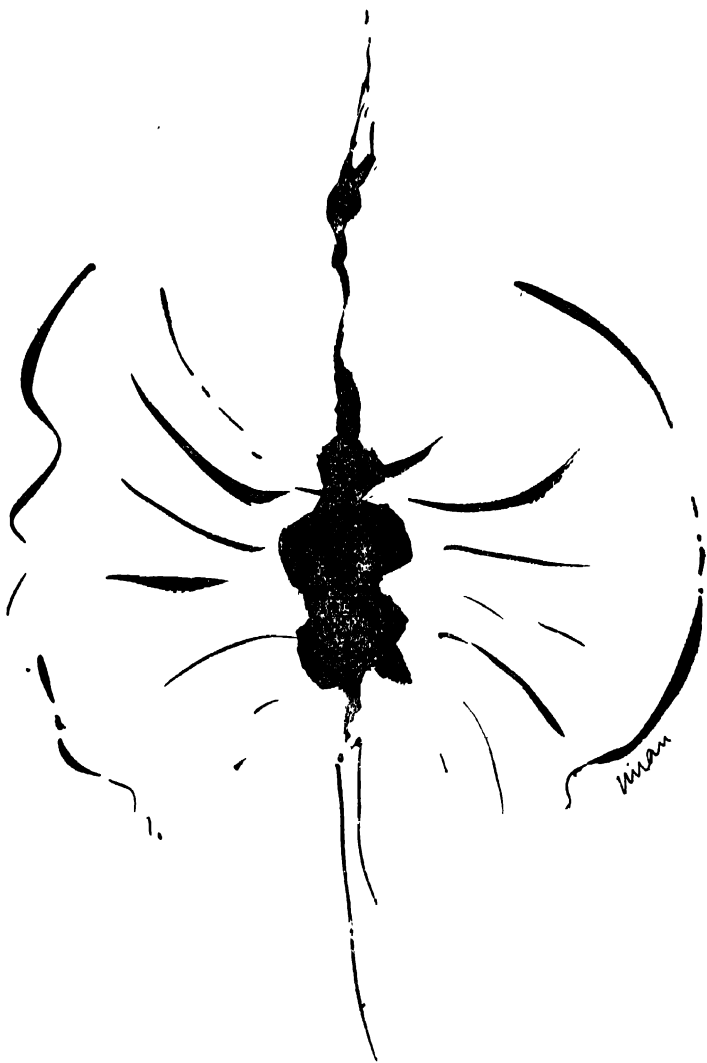
কেননিন মঠের আচার্য ছিলেন মোকুরাই বা স্তব্ধবজ্র। তোয়ো নামে তাঁর এক ছোটো ছাত্র ছিল, তার বয়স মাত্র বারো। তোয়ো দেখতো প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররা সকালে সন্ধ্যায় আচার্যের কক্ষে গিয়ে জেনের পাঠ নিচ্ছেন। দেখে দেখে তারও ইচ্ছে হলো। 'অপেক্ষা করো। তুমি এখনো খুব ছোটো'। মোকুরাই বললেন। বালকটির জেদ দেখে শেষে মোকুরাই তাকে পাঠ দিতে সম্মত হলেন। মোকুরাই বললেন :

'দুহাতে তালি দিলে তুমি শুনতে পাও। এখন আমাকে এক হাতের তালি শোনাও।'

তোয়ো আচার্যকে যথাবিধি নমস্কার জানিয়ে তার নিজের কক্ষে গিয়ে এই সমস্যা পূরণে ব্রতী হলো। জানালা দিয়ে পেইশাদের বাজনার শব্দ আসছে, সে শুনলো। 'পেয়েছি'। তোয়ো মনে মনে বললো। পরের সন্ধ্যায় আচার্য তাকে এক হাতের তালি দেখাতে বললে সে ঐ বাজনার অনুকরণ করলো। মোকুরাই বললেন :

'না, না। ও ভাবে হবে না। ও একহাতের তালি নয়। তুমি কিছুই পাওনি।'

তোয়ো ভাবল বাজনা সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাবে, তাই সে এক নির্জন কোণ বেছে নিয়ে আবার ধ্যানে বসলো। সে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেলো। পেয়েছি, মনে মনে ভাবলো তোয়ো। আর

পরের বার আচার্যের সামনে সে জল পড়ার শব্দের অভিনয় করে শোনালো।

'ও কী। ও তো জল পড়ার শব্দ, এক হাতের তালি নয় তো। আবার চেষ্টা করো।'

বৃথাই তোয়ো এক হাতের তালি শোনার কথা ভাবলো। হাওয়ার শব্দ শুনলো সে। কিন্তু সে শব্দ বাতিল হলো। পেঁচার শব্দ শুনলো সে। কিন্তু সে শব্দ খারিজ হলো। পঙ্গপালের শব্দ শুনলো সে। কিন্তু সে শব্দ নাকচ হলো।

তোয়ো বার দশেক নানা শব্দ নিয়ে মোকুরাইকে দর্শন করলো। সব শব্দই ভুল, সব শব্দই প্রত্যাখ্যাত হলো। তোয়ো প্রায় বৎসর কাল ধরে গভীর ভাবে ভেবে গেলো, তাহলে এক হাতের তালি কী হতে পারে।

অবশেষে বালক তোয়ো প্রকৃত ধ্যানের জগতে প্রবেশ করলেন এবং সব শব্দ উত্তীর্ণ হলেন।

তিনি বললেন: 'আমি আর শব্দ সংগ্রহ করতে পারছি না। তার অর্থ আমি ধ্বনিহীন ধ্বনির রাজ্যে এসে পৌঁছেছি।'

তোয়ো এক হাতের তালি বুঝতে পেরেছেন।

এশুনের বিদায়

ষাট বছর পার হলে সাধিকা এশুন পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন। তিনি কিছু সাধুকে মঠের আঙিনায় কাঠ জড়ো করতে

বললেন।

দৃঢ় হয়ে চিতার মাঝখানটিতে বসে তিনি চিতার চারধারে আগুন ধরিয়ে দিতে বললেন।

একজন সাধু চীৎকার করে বললেন: 'মহাথেরী, ও কী উত্তপ্ত?' এশুন বললেন: 'আপনার মতো মূর্খই খালি এ নিয়ে ভাববে।'

শিখা ঘিরে উঠলো, এশুন চলে গেলেন।

সূত্র পাঠ

এক কৃষক তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর জন্য এক তেনদাই পুরোহিতকে সূত্র পাঠ করার অনুরোধ জানালেন। পাঠ শেষ হলে কৃষক জিজ্ঞাসা করলেন: 'আপনি কি মনে করেন এতে আমার স্ত্রীর লাভ হবে?'

'কেবল আপনার স্ত্রী নন, সকল ভূতজগৎ এই সূত্রপাঠে পরিতৃপ্ত হবেন।'

কৃষকটি বললেন: 'যদি সর্বভূত এতে লাভবান হয় তা হলে আমার স্ত্রীর ক্ষতি হবে। সকলে তার থেকে সুবিধা নিয়ে নিলে তিনি অতি দুর্বল হয়ে পড়বেন। অতএব একান্তভাবে শুদ্ধ তাঁর জন্যই দয়া করে সূত্রপাঠ করুন।'

পুরোহিত ব্যাখ্যা করে বললেন, 'সর্বলোকের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনাই একজন বুদ্ধবাদীর কাজ।'

কৃষকটি সব শুনলেন, শেষে বললেন: 'এ খুব সুন্দর শিক্ষা। কিন্তু দয়া করে একটি ব্যতিক্রম ঘটান। আমার এক প্রতিবেশী

আছে, সে অত্যন্ত অভদ্র আর সংকীর্ণমনের মানুষ। কেবল তাকেই সর্বভূত থেকে বাদ দিন।'

আর তিন দিন

নির্জন গ্রীষ্মবাসের সময় আচার্য সুইয়োর কাছে দক্ষিণ জাপান থেকে এক শিষ্য এলেন। সুইয়ো তাকে সমস্যা দিলেন : 'এক হাতের তালি শুনুন'। তিন বছর গেলো, শিষ্যটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। এক রাত্রে তিনি সাশ্রুচোখে আচার্যের কাছে এসে বললেন : 'লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে আমি দক্ষিণে ফিরে যাবো। কারণ আমি সমস্যা পূরণ করতে পারলাম না।'

'আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন এবং নিয়ত ধ্যান করুন।' আচার্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু শিষ্যের বোধিলাভ হলো না। 'আরও এক সপ্তাহ চেষ্টা করুন।' শিষ্যটি আদেশ পালন করলেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা বৃথা হলো। 'আরও এক সপ্তাহ।' অথচ কোনো ফল হলো না। নিরাশ হয়ে শিষ্য বিদায় প্রার্থনা করলেন। আচার্য আর পাঁচ দিন ধ্যানের অনুরোধ করলেন। তাতেও কোনো ফল হলো না। আচার্য তখন বললেন : 'আর তিন দিন ধ্যান করুন। যদি তারপরেও বোধি না পান, নিজেকে আপনার হত্যা করাই ভালো।'

দ্বিতীয় দিন শিষ্যটি বোধি লাভ করলেন।

কিছু নেই

তরুণ জেনবাদী ছাত্র ইয়ামাওকা তেসস্যু একজনের পর একজন শিক্ষকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি দোকুয়নের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইয়ামাওকা তাঁর জ্ঞান দেখানোর জন্য বললেন: 'মন, বুদ্ধ, সত্তা—এসব কিছুই নেই। বস্তুর প্রকৃত স্বভাব শূন্যতা। বোধ ব'লে কিছু নেই, মায়া ব'লে কিছু নেই, কোনো ভিক্ষু নেই, কোনো মাধ্যমিকতা নেই। কোনো দান নেই, কোনো অর্জন নেই।'

দোকুয়ন ধূমপান করতে করতে নিঃশব্দে শুনছিলেন, কোনো মন্তব্য করছিলেন না। হঠাৎ বাঁশের পাইপটা তিনি ইয়ামাওকার মাথায় খুব জোরে ঠুকে দিলেন। এতে ইয়ামাওকার খুব রাগ হলো।

দোকুয়ন জানতে চাইলেন: 'যদি কিছুই না থেকে থাকে, তা হলে এই রাগটা এলো কোথা থেকে?'

কাজ নেই, খাবার নেই

চীনদেশের জেন শিক্ষক হিয়াকুজো আশি বছর বয়সেও ছাত্রদের সঙ্গে খাটতেন। দেখা যেতো তিনি বাগান ঝাঁট দিচ্ছেন, ঘাস কাটছেন, ডাল ছাঁটছেন।

বুড়ো শিক্ষকের কঠিন কাজ দেখে ছাত্রদের খারাপ লাগতো।

তাঁরা জানতেন যে শিক্ষক তাঁদের নিষেধ শুনবেন না, তাই তাঁরা শিক্ষকের বাগানের কাজের যন্ত্রপাতি লুকিয়ে রেখে দিলেন।

শিক্ষক সে দিন খেলেন না, পরের দিনও খেলেন না, তার পরের দিনও তাঁর না খেয়ে কাটলো। ছাত্ররা ভাবলেন : যন্ত্রপাতি লুকিয়েছি তাই বোধহয় উনি রাগ করেছেন। আমরা ওগুলো ফিরিয়ে দেবো।

ছাত্ররা তাই করলেন। শিক্ষক পরের দিন কাজ করলেন, তার-পর আগের মতোই খাওয়া দাওয়া করলেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা ছাত্রদের উপদেশ দিলেন : 'কাজ নেই, খাবার নেই।'

সুখের স্বর

সাধু বানকেই গত হলে পর তাঁর মঠের কাছাকাছি থাকেন এমন একজন অন্ধ মানুষ তাঁর বন্ধুটিকে বললেন : 'দেখুন, আমি অন্ধ, আমি তাই কারো মুখ দেখতে পারি না। গলার স্বর শুনে লোকটি কেমন তা আমাকে ঠিক করে নিতে হয়। সাধারণত কেউ যখন কারুকে কোনো সুখ বা সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন শুনি, তখন আমি ঈর্ষার একটি গোপন স্বরও শুনতে পাই। যখন কারো দুর্ভাগ্যসূচক কোনো শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় তখনও আমি আনন্দ আর পরিতৃপ্তির স্বর শুনতে পাই। মনে হয় শোকাহত কেউ যেন এই ভেবে সত্যকার খুশি যে একান্তভাবে তার নিজের জগতে কিছু লাভ করার থেকে গেল। যাই হোক, আমার

অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বানকেইয়ের কণ্ঠ সব সময় আন্তরিক ছিল। তিনি যখন আনন্দ প্রকাশ করতেন আমি নন্দিত কণ্ঠ ছাড়া কিছুই শুনতে পেতাম না। আর তিনি যখন দুঃখ প্রকাশ করতেন তখন কেবল দুঃখেরই অভিব্যক্তি শুনতে পেতাম।'

আপন ভাণ্ডার

দাইজু চিনের সাধু বাসোকে দর্শন করলেন। বাসো জানতে চাইলেন: 'আপনি কী সন্ধান করছেন?' 'বোধি': দাইজু উত্তর দিলেন।

'আপনার একান্ত নিজস্ব ভাণ্ডার আছে। আপনি বাইরে অন্বেষণ করছেন কেন?' বাসো জিজ্ঞাসা করলেন। দাইজু জানতে চাইলেন: 'আমার ভাণ্ডার কোথায়?' বাসো বললেন: 'আপনার জিজ্ঞাসাই আপনার ভাণ্ডার।' দাইজু বোধি লাভ করলেন। এর পর থেকে তিনি বন্ধুদের এই ব'লে প্রেরণা দিতেন: 'আপনার নিজের ভাণ্ডার খুলুন এবং আপন ঐশ্বর্য ব্যবহার করুন।'

জল নেই, চাঁদ নেই

এনগাকু-র বুককোর কাছে পাঠরত সাধিকা চিয়োনো সুদীর্ঘকাল তাঁর ধ্যানের ফল ভোগ করতে অপারগ হয়েছিলেন। অবশেষে এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে তিনি যখন জল বহন করে আনছেন হঠাৎ বাঁশের ভারটি ভেঙে গিয়ে প্রাচীন পাত্রটির তলা খুলে গেল আর

চিয়োনোও তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভ করলেন। এ ঘটনার স্মৃতিতে চিয়োনো এই কবিতাটি লিখেছিলেন :

বাঁশের ভারটা ছিল পলকা, দুর্বল,—
পুরোনো পাত্রটা তাই কোনোমতে চেয়েছি বাঁচাতে।
আর শেষে পাত্রটার তলা গেল খসে।
নেই আর জল পাত্রটাতে।
নেই আর চাঁদও জলটাতে।

পরিচয়-পত্র

মেইজি যুগের কিয়োতোয় তোফুকু মঠের প্রধান ছিলেন জেন শিক্ষক আচার্য কেইচু। কিয়োতোর রাজ্যপাল তাঁকে সেই প্রথম দর্শন করতে এসেছিলেন। পরিচারকটি তাঁর পরিচয়পত্র বহন করে নিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল : 'কিতাগাকি, কিয়োতোর রাজ্যপাল।' দেখে কেইচু তাঁর পরিচারককে বললেন : 'এরকম কোনো লোকের সঙ্গে আমার কোনো কাজ নেই। তাকে এখনই চলে যেতে বলো।'

পরিচারকটি বিনীতভাবে পরিচয়পত্রটি ফিরিয়ে দিয়ে গেল। রাজ্যপাল বললেন : 'আমার ভুল হয়েছিল।' এই বলে তিনি পরিচয়পত্র থেকে 'কিয়োতোর রাজ্যপাল' কথাটি কেটে দিলেন। বললেন : 'আপনি আচার্যর কাছ থেকে আবার জেনে আসুন।' আচার্য পরিচয়পত্রটি দেখে এবার বললেন : 'ও, কিতাগাকি। এ মানুষটির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

সর্বশ্রেষ্ঠ

বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বানজান এক কশাই আর এক খরিদ্দারের কথা শুনতে পেলেন। লোকটি বলছে : 'সব চেয়ে ভালো মাংসটি আমাকে দিন।' শুনে কশাই বললো : 'আমার দোকানের সব জিনিস সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে ভালো নয় এমন একটুকরো মাংসও আপনি এখানে পাবেন না।' এ কথা শুনে বানজান বোধি লাভ করলেন।

রত্নযোগ

এক প্রশাসক তাকুয়ান নামে জেন শিক্ষকের কাছ থেকে সময় কীভাবে কাটাবেন তা জানতে চাইলেন। দপ্তরে খাড়া হয়ে বসে থেকে অন্যদের নমস্কার নিতে নিতে তাঁর দিন অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। তাকুয়ান আটটি চিনে অক্ষরের এই চিত্রলিপি রচনা করে প্রশাসককে দিলেন।

এই দিন দুবার নয়
তিল কাল রত্ন যায়।

মোকুসেনের হাত

তামবা প্রদেশের এক মন্দিরে মোকুসেন হিকি থাকতেন। তাঁর এক ভক্ত তাঁর স্ত্রীর কৃপণতার অভিযোগ করলেন। মোকুসেন তাঁর

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। মহিলার মুখের সামনে হাত মুঠো করে তুলে ধরলেন তিনি। মহিলা অবাক হয়ে বললেন : 'এর মানে কী ?' মোকুসেন বললেন : 'মনে করুন আমার হাত সবসময় এরকম। তাহলে আপনি একে কী বলবেন ?' 'প্রতিবন্ধী' : মহিলা উত্তর দিলেন।

মোকুসেন তখন মহিলার মুখের সামনে তাঁর করতল মেলে ধরলেন। বললেন : 'মনে করুন আমার হাত সবসময় এরকম। তা হলে ?' মহিলা বললেন : 'আরেক রকমের প্রতিবন্ধী।' মোকুসেন বললেন : 'যদি তা বুঝে থাকেন তবে আপনি সুগৃহিণী।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। এর পর থেকে মহিলা স্বামীকে ব্যয় ও সঞ্চয়ের কাজে সমান সাহায্য করতেন।

জীবনে হাসি

গত হবার আগের দিন পর্যন্ত মোকুসেনকে কেউ হাসতে দেখেন নি। প্রয়াণকালে তিনি শ্রাবকদের বললেন : 'এক দশকের বেশি হলো তোমরা আমার কাছে পাঠ গ্রহণ করেছো। আমাকে জেনের প্রকৃত তাৎপর্য দেখাও। যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট করতে পারবে সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমার পাত্র-চীবর পাবে।' শুনে সকলে মোকুসেনের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না।

এনকো নামে এক পুরোনো শ্রাবক শয্যার কাছে সরে এলো।

ওষুধের পাত্রটিকে সে এক বিঘৎ এগিয়ে দিল। এই হলো তাঁর প্রশ্নের উত্তর। আচার্যের মুখ কঠিনতর হলো। 'তুমি এই বুঝেছ?' মোকুসেন জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে এনকো পাত্রটি হাতে ধরে যথাপূর্ব সরিয়ে রাখলেন।

মোকুসেনের সর্বশরীর হাসিতে দীপ্ত হলো। এনকোকে তিনি বললেন : 'জাল্ম ছেলে। দশ বছর আমার কাছে পাঠ অভ্যাস করেছ তুমি। কিন্তু আমাকে দেখা তোমার বাকি আছে। নাও, পাত্র-চীবর নাও। এদুটি তোমার।'

সবসময় জেন

জেন শেখানোর আগে ছাত্ররা নিজেরা কম করেও দশ বছর জেন শেখে। শিক্ষানবিশি পর্যায় পেরিয়ে তেননো নান-ইনের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে তাই তেননো কাঠের জুতো পরে আর ছাতা নিয়ে এসেছিলেন। সম্ভাষণ শেষে নান-ইন বললেন : 'মনে হয় আপনার জুতো আপনি বারান্দায় ফেলে এসেছেন। আর আপনার ছাতা জুতোর ডাইনে না বাঁয়ে আছে আমি জানতে চাই।' হতভম্ব তেননো তখনই কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। বুঝলেন সবসময়ের জেন তিনি শেখেন নি। নান-ইনের ছাত্র হয়ে তিনি আরো ছবছর প্রতি মুহূর্তের জেন শিক্ষা করলেন।

পুষ্পবৃষ্টি

বুদ্ধশিষ্য সুভূতি। সুভূতি শূন্যতার বোধ অর্জন করেছেন। একদিন সুভূতি শূন্যতায় স্বমহিম হয়ে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। তাঁর উপর পুষ্প বর্ষিত হতে থাকলো। দেবতারা অনুচ্চারে বললেন: 'আপনার শূন্যতাসূত্রকে অভিনন্দন জানালাম।' সুভূতি বললেন: 'আমি শূন্যতাসূত্র তো আলোচনা করি নি।' দেবতারা উত্তর দিলেন: 'আপনি শূন্যতা আলোচনা করেন নি। আমরাও শূন্যতা শুনি নি। এই হলো সত্যকারের শূন্যতা।' আবার সুভূতির উপর পুষ্প বৃষ্টি হলো।

সূত্র প্রকাশ

তখন সূত্রগুলি শুধু চিনে ভাষায় পাওয়া যেতো। তেৎসুগেন নামে এক জাপানি ভক্ত সে সমস্ত জাপানি ভাষায় প্রকাশ করবেন ঠিক করলেন। কাঠখোদায়ে ছাপা হয়ে সাত হাজার খণ্ড বই বার হবে ঠিক হলো। এ এক অক্লিষ্ট উদ্যোগ।

তেৎসুগেন এ উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে অনুদান সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগলেন। কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ তাঁকে শত স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, কিন্তু তিনি বেশির ভাগই ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা পেয়েছিলেন। প্রত্যেক দাতাকে তিনি একইরকমভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। দশ বৎসর পরে তেৎসুগেন দেখলেন যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে।

ঠিক সেই সময় উজি নদীতে বান ডাকলো। বন্যার পর এলো দুর্ভিক্ষ। তেৎসুগেন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সংগৃহীত অর্থ নিয়ে তা উপবাসক্লিষ্ট মানুষজনের জন্য ব্যয় করলেন। তারপরে তিনি আবার তাঁর অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন।

কয়েক বছর পরে মহামারী দেখা দিল। তেৎসুগেন তাঁর সঞ্চিত সমূহ অর্থ দেশবাসীর জন্য ব্যয় করলেন।

তেৎসুগেন তৃতীয়বার কাজ শুরু করলেন, কুড়ি বছর পরে তাঁর ইচ্ছাপূরণ হলো। কিয়োতোর ওবাকু মঠে সূত্রগুলির প্রথম সংস্করণের ছাপার কাজে ব্যবহৃত কাঠখোদাইগুলি এখনো দেখা যায়।

জাপানিরা তাঁদের সন্তানদের বলেন : তেৎসুগেন তিন প্রস্ত সূত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম দুপ্রস্ত সূত্র অদৃশ্য, কিন্তু তারা প্রকাশিত শেষ সূত্রসমূহকে অতিক্রম করে গিয়েছে।

গিশোর কাজ

দশ বছর বয়সে গিশো সন্ন্যাসিনীরূপে দীক্ষা নেন। ষোলো বছর বয়স থেকে তিনি এক একজন জেন সাধকের কাছে ঘুরে ঘুরে ধ্যান অভ্যাস করতে থাকেন। উনজানের কাছে তিন বছর, গুকেইয়ের কাছে ছবছর শিষ্যা হয়ে থেকেও তাঁর দৃষ্টি স্পষ্ট হলো না। শেষে তিনি আচার্য ইনজানের কাছে গেলেন। ইনজান গিশোকে নারী ব'লে বিশেষ চোখে দেখতেন না। বিদ্যুৎগর্ভ ঝটিকার মতো

তিরস্কার ও প্রহার করে তিনি ইনজানের অন্তঃপ্রকৃতিকে জাগাতে চাইতেন। গিশো ইনজানের সঙ্গে তেরো বছর থাকলেন, শেষে তাঁর অন্বেষণের অবসান ঘটলো। ইনজান তাঁর সম্মানে একটি কবিতা লিখেছিলেন :

তেরো বছর আমার শিষ্যা ছিলেন সন্ন্যাসিনী।
সন্ধ্যাবেলা ভেবে যেতেন গহনতম কোয়ান।
সকালে আরো কোয়ান নিয়ে বিব্রত যে তিনি।
চিনা সাধিকা তেৎসুমা সব ছাড়িয়ে চলে যান।
আর মুজাকুর পরে গিশোর মতন কেউ নন।
কিন্তু তাঁকে পেরিয়ে যেতে হবে আরো তোরণ।
লোহার সমান আমার মুঠির প্রহার পাবেন তিনি।

বোধিলাভের পর গিশো বানস্যু প্রদেশে চলে গিয়ে একটি জেন মন্দির স্থাপন করেন। তুশো শিষ্যাকে শিক্ষাদানের পর সহসা একদিন তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

দিবানিদ্রা

একষট্টি বৎসর বয়সে আচার্য শোয়েন শাকু ইহলোক ত্যাগ করেন। মধ্যগ্রীষ্মের দিবাভাগে তাঁর শিষ্যদের অনেকে নিদ্রা যেতেন, আচার্য তা দেখেও দেখতেন না; তিনি কিন্তু তাঁর নিজের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হতে দিতেন না।

বারো বছর বয়সেই শোয়েন শাকু তেনদাই-এর দার্শনিক

ভাষ্য পাঠ করছিল। একবার গরমকালের দুপুর এত গুমোট ছিল যে ছোটো শোয়েন গুরুর অনুপস্থিতিতে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তিনঘণ্টা পরে হঠাৎ জেগে উঠে শোয়েন তার গুরুর পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দরজাব সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল শোয়েন। যেন কোনো বিশেষ সম্মানিত অতিথিকে পেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সাবধানে পা ফেলে শোয়েনের শায়িত শরীর বাঁচিয়ে তার গুরু চলে গেলেন। 'মাফ করবেন, মাফ করবেন', অস্ফুটে এই কথা বলে চলেছিলেন তিনি। এরপর শোয়েন আর কোনো দিন দিবানিদ্রা দেন নি।

স্বপ্নে

শোয়েন শাকুকে একজন পোড়ো বললো : 'আমাদের গুরুমশাই রোজ দুপুরে ঘুমোন। আমরা গুরুমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এরকম করেন কেন।' গুরুমশাই বললেন : 'আমি কনফুশিয়াসের মতোই ঋষিদের সঙ্গে দেখা করতে রোজ স্বপ্নের রাজ্যে চলে যাই। কনফুশিয়াস ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের রাজ্যে চলে যেতেন, সেখানে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে তাঁর দেখা হতো, আর পরে শিষ্যদের সেসব কথা তিনি বলতেন।'

একদিন ভারি গুমোট ছিল তাই আমরা অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গুরুমশাই আমাদের বকলেন। আমরা বললাম : 'আমরা কনফুশিয়াসের মতোই প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে দেখা করতে

স্বপ্নের রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম।' 'ঋষিরা কী বললেন?' গুরুমশাই জানতে চাইলেন। আমরা তখন বললাম: 'আমরা স্বপ্নের রাজ্যে গেলাম আর প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম যে আমাদের গুরুমশাই এখানে রোজ দুপুরে আসেন কিনা। কিন্তু ঋষিরা বললেন যে তাঁরা কখনোই ওরকম কোনো লোককে দেখেন নি।'

যোশু-র জেন

ষাট বছর বয়সে জেন সাধনা শুরু করে আশি বছরে যোশু জেন অনুভব করলেন। তারপর আশি থেকে একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের জেন শিখিয়ে চললেন।

একবার এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: 'আমার মনে যদি কিছু না থাকে তা হলে আমি কী করবো?'

যোশু বললেন: 'ফেলে দাও।'

শিষ্য বলে চললো: 'কিন্তু আমার মনের মধ্যে যদি কিছুই না থাকে তাহলে কেমন করে আমি তা ফেলে দেবো?'

যোশু বললেন: 'বেশ। তা হলে রেখে দাও।'

মৃতের উত্তর

আচার্য হবার আগে মামিয়া তাঁর গুরুর কাছে পাঠ নিচ্ছিলেন। গুরু তাঁকে এক হাতের তালি শোনাতে বললেন। মামিয়া ভেবেই

চললেন, উত্তর পেলেন না। গুরু বললেন : 'তুমি টাকা পয়সা খাবার দাবার শব্দ সব কিছুর কথাই ভাবছো। এর চেয়ে মরে যাও। তা হলেই সব সমাধান হবে।'

পরের বার দেখা হতেই গুরু মামিয়াকে এক হাতের তালি শোনাতে বললেন। মামিয়া মৃতের মতন পড়ে গেলেন। গুরু বললেন : 'তুমি তাহলে মরে গেছো। কিন্তু এক হাতের তালি কই ?'

মামিয়া গুরুর মুখ চেয়ে বললেন, 'ওটার এখনো সমাধান হয় নি।' গুরু বললেন : 'মরা মানুষ কথা বলে না। তুমি দূর হয়ে যাও।'

ভিক্ষুকের জেন

তোসুই তাঁর সময়ের একজন বড়ো জেন গুরু ছিলেন। তিনি অনেক মঠে ঘুরেছিলেন, অনেক প্রদেশে শিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন। শেষ মন্দিরটায় তাঁর এত শিষ্য হয়েছিল যে তোসুই বললেন তিনি আর কখনোই উপদেশ দেবেন না। তিনি শিষ্যদের যার যেখানে খুশি চলে যেতে বললেন। তারপর তাঁরা আর তাঁর কোনো খোঁজ পেলেন না।

তাঁর এক শিষ্য তিন বছর পরে কিয়োতো সেতুর তলায় কয়েক-জন ভিখারির মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেলেন। পেয়েই তিনি তোসুইকে উপদেশ দেবার জন্য অনুনয় করতে শুরু করে দিলেন। তোসুই তখন বললেন : 'আমার সঙ্গে আমার মতো করে যদি কয়েকদিনও

থাকতে পারো, তা হলে তোমাকে উপদেশ দিতে পারি।'

এই শুনে শিষ্যটি ভিখারির পোশাক পরে তোস্থুইয়ের সঙ্গে পুরো এক দিন কাটালেন। পরের দিন একজন ভিখারি মারা গেলেন। তোস্থুই মধ্যরাতে তাঁর শিষ্যকে সঙ্গী করে মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের কাছে এক স্থানে তাঁর সমাধি দিলেন। তোস্থুই তারপর ফিরে এসে বাকি রাত বেশ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন, শিষ্যটি চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। ভোর হলে তোস্থুই বললেন: 'আজ আর আমাদের ভিক্ষেয় যেতে হবে না। আমাদের মৃত বন্ধুটি কিছু খাবার রেখে গেছেন।' কিন্তু সে খাবার শিষ্যটি মুখেও তুলতে পারলেন না। তোস্থুই তখন বললেন: 'আমি তো বলেই-ছিলাম তুমি আমার মতো পারবে না। এখন এখান থেকে বিদায় হও, পরেও আর কখনো আমায় এরকম জ্বালাতন করতে এসো না।'

চোর থেকে শিষ্য

এক সন্ধ্যায় শিচিরি কোজুন একা বসে সূত্র আবৃত্তি করছেন, এমন সময় একটা চোর একটা ধারালো তরোয়াল নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর টাকা না হয় তাঁর জীবন দাবি করলো। শিচিরি বললেন: 'আমাকে বিরক্ত করো না। কুলুঙ্গিতে টাকা পাবে।' এই বলে তিনি আবার আবৃত্তিতে মন দিলেন। অবশ্য একটু পরেই তিনি থেমে গিয়ে বললেন: 'সবটা নিয়ে যেও না। আমায় কাল আবার কর

দিতে হবে।' তার পর অনাহূত মানুষটি বেশির ভাগ টাকা গুছিয়ে নিয়ে বার হতে যাবে এমন সময় শিচিরি আবার বললেন : 'উপহার পেলে মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।' চোর ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

কদিন পরে লোকটা ধরা পড়লো। সে শিচিরির কাছ থেকে চুরি করার দোষও স্বীকার করলো। সাক্ষী হিশেবে ডাকা হলে শিচিরি বললেন : 'আমার দিক দিয়ে আমি এইটুকু বলতে পারি, মানুষটি চোর নন। আমি তাঁকে অর্থ দান করেছিলাম এবং তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।' জেলখানার মেয়াদ শেষ হলে পর মানুষটি শিচিরির কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর শিষ্য হয়ে গেলেন।

ভুল ঠিক

বানকেই যখন নির্জনে ধ্যান করছিলেন তখনও জাপানের নানা জায়গা থেকে শিষ্যরা এসে জুটেছিলেন। এঁদের মধ্যে এক শিষ্য চুরির দায়ে ধরা পড়লেন। বানকেইকে শিষ্যরা ব্যাপারটা জানালেন, আর চোরটাকে তাড়িয়ে দেবার কথাও বললেন। বানকেই ঘটনাটা উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কদিন পরে শিষ্যটি আবার একই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। বানকেই এবারও ঘটনাটা বিবেচনা করে দেখলেন না। তখন অন্য শিষ্যরা রেগে গিয়ে একটা আবেদন-পত্রে লিখলেন যে হয় চোরটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক না হলে তাঁরা সকলেই একসঙ্গে ওখান থেকে চলে যাবেন।

বানকেই চিঠি পড়ে সবাইকে ডাকলেন। বললেন : 'তোমরা সব জ্ঞানী ভাই। তোমরা জানো কোনটা করা ঠিক আর কোনটা করা ঠিক নয়। তোমরা যদি চাও তো অন্য কোথাও সাধনার জন্য যেতে পারো। কিন্তু এই বেচারা ভাই যে ভুল ঠিক কিছুই জানে না। আমি যদি না শেখাই ওকে কে শেখাবে? তোমরা যদি সকলে চলেও যাও আমি ওকে এখানে রেখে দেবো ঠিক করেছি।' এই কথা শুনে যে শিষ্যটি চুরি করেছিলেন তাঁর মুখ চোখের জলে ধুয়ে গেল। তাঁর চুরি করার বাসনা মুছে গেল।

ঘাস বোধি গাছ বোধি

কামাকুরা যুগের শিনকান জাপানে ছবছর তেনদাই শিখে তারপর আবার সাত বছর জেন শিখেছিলেন। তারপরে তিনি চিনে গিয়ে আরো তেরো বছর জেন শিখে এলেন। জাপানে ফিরে আসায় লোকজন তাঁর সঙ্গে খুব দেখা করতে চাইতো আর তাঁকে এলো-মেলো প্রশ্ন করতো। শিনকান বেশি লোককে দর্শন দিতেন না, বেশি বাক্য ব্যয়ও করতেন না।

একদিন এক প্রৌঢ় তাঁকে বললেন: 'ছেলেবেলা থেকেই তেন-দাই শিখছি। একটা কথা বুঝতে পারছি না। তেনদাইয়ে বলা আছে ঘাস গাছও বোধি লাভ করবে। এটা আমার খুব অবাক লাগছে।' শুনে শিনকান বললেন: 'ঘাস আর গাছ কীভাবে বোধি লাভ করবে তা আলোচনা করার দরকারটা কী। প্রশ্নটা হলো,

আপনি কী করে বোধি লাভ করবেন। বলি সেটা কখনো ভেবে-ছেন?' প্রৌঢ় শুনে আশ্চর্য হয়ে স্বীকার করলেন : 'না, এরকম-ভাবে আমি কখনো ভাবি নি।'

'এবার তা হলে বাড়ি যান আর ভাবুন।' এখানেই শিনকানের কথা শেষ হয়ে গেল।

কৃপণ শিল্পী

গেসেন শিল্পী-সাধু। তিনি ছবি আঁকবার আগে আগাম চেয়ে নিতেন, আর চড়া দামে ছবি বেচতেন। তাঁকে কৃপণ শিল্পী ব'লে সকলে জানতো। একবার এক গেইশা তাঁকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতে চাইলেন। গেসেন তাঁর পাওনা গণ্ডার কথা পাড়লেন। মহিলা বললেন : 'টাকা যা বলবেন পাবেন, ছবিটা আমার সামনে আঁকতে হবে।' গেসেন রাজি হলেন। নির্দিষ্ট দিনে গেইশা শিল্পীকে ডেকে পাঠালেন। গেইশাটি তখন অনেককে পান ভোজনে নৃত্য-গীতে আপ্যায়িত করছিলেন। সেই উৎসবের মধ্যে বসে নিপুণ হাতে তুলি চালিয়ে গেসেন ছবিটি শেষ করলেন, তারপর বাজারের সবচেয়ে চড়া দাম হাঁকলেন। গেসেনকে টাকা দিয়ে গেইশা তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের দিকে ফিরে বললেন : 'এই সব শিল্পী টাকা ছাড়া কিছু চায় না। ইনি আঁকেন ভালো, কিন্তু এঁর মন নোংরা, টাকা এঁর মনটাকে কাদা করে দিয়েছে। এইসব নোংরা মনের কাজ বাইরে দেখানোর মতো নয়। এ প্রদর্শনীতে টাঙানোর উপযুক্ত

নয়, আমার শায়াতে আঁকার উপযুক্ত।' এই বলে গেইশাটি নিজের ওপরের পোশাক সরিয়ে দিয়ে গেশেনকে তাঁর শায়ার পেছনে আরেকটি ছবি এঁকে দিতে বললেন। গেসেন জানতে চাইলেন তিনি কতো টাকা দেবেন। গেইশা উত্তর দিলেন : 'আঃ, যা চান পাবেন।' গেসেন একটা অসম্ভব দর হাঁকলেন, গেইশার শায়ার পেছনে চিত্র করলেন এবং টাকা নিয়ে বিদায় হলেন।

গেসেনের টাকা চাওয়ার কারণ ছিল। ঐ দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ হতো, ধনীরা গরিবদের কোনো সাহায্য করতো না। গেসেন গোপনে একটি শস্য ভাণ্ডার গড়ে তুলছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঐ গাঁ থেকে জাতীয় পাদপীঠে যাবার ভালো রাস্তা ছিল না তাই অনেক পথচারীর খুব কষ্ট হতো। গেসেন একটি ভালো রাস্তা বানাতে চাইছিলেন। তৃতীয়ত, সংকল্পিত একটি মন্দির গড়ার আগেই তাঁর গুরু গত হয়েছিলেন। গেসেন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন। যেদিন গেসেনের এই তিনটে ইচ্ছে পূরণ হলো তিনি রং তুলি ছুঁড়ে দিয়ে সেই যে নির্জন পার্বত্য-আবাসে চলে গেলেন তারপর তিনি আর কখনো তুলি ধরেন নি।

শেষ মার

তানগেন সেনগাইয়ের কাছে ছেলেবেলা থেকে জেন শিখেছেন। তাঁর বয়স যখন বছর কুড়ি তখন তিনি অন্য গুরু ধরবেন ঠিক করলেন, কিন্তু সেনগাই তা হতে দেবেন না। যখনই তানগেন

যাওয়ার কথা বলেন সেনগাই তাঁর মাথা ঠুকে দেন।

শেষে তানগেন তাঁর দাদাকে সেনগাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে আনতে বললেন। দাদা সেই মতো কাজ করলেন, ফিরে এসে তানগেনকে বললেন : 'সব ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে। আমি ব্যবস্থা করে এসেছি, তুমি এখনই যাত্রা করতে পারবে।'

সেনগাই অনুমতি দিয়েছেন, তানগেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে গেলেন। সেনগাই কিছু না বলে আবার তাঁর মাথা ঠুকে দিলেন।

তানগেন ফিরে এসে দাদাকে একথা বললেন। দাদা বললেন : 'এ কী ব্যাপার? সেনগাই একবার যেতে ব'লে আবার না করতে পারেন না। আমি তাঁকে একথা বলবো।' এই ব'লে তিনি সেনগাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

সেনগাই বললেন : 'আমি অনুমতি নাকচ করি নি। আমি শেষবারের মতো ওর মাথা ঠুকে দিয়েছি। ও যখন বোধি লাভ ক'রে ফিরে আসবে তখন তো ওকে আর মারতে পারবো না। তাই শেষ মার মেরে নিলাম।'

তিন ডাক

চু সম্রাটের শিক্ষক। তিনি ছাত্র ওশিনকে ডাকছেন।—'ওশিন

ওশিন উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ।'

চু আবার ডাকলেন : 'ওশিন।'

ওশিন আবার উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ।'

চু ডাকলেন : 'ওশিন।'

ওশিন উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ।'

চু বললেন : 'এতবার ডাকার জন্য তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়ার কথা। আসলে আমার কাছে তোমারই এজন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

মরার সময়

জেন শিক্ষক ইককিউ ছেলেবেলা থেকেই খুব চালাক। তাঁর শিক্ষকের একটা দামি চায়ের বাটি ছিল, সেটি এক প্রত্ন শিল্প-কাজের নমুনা। একদিন ইককিউ কোনোভাবে সেই চায়ের বাটি ভেঙে ফেলেছেন, কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শিক্ষকের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো পিছনে সরিয়ে রাখলেন। শিক্ষক এলে ইককিউ জানতে চাইলেন : 'মানুষ মরে কেন?'

বুড়ো শিক্ষক বিশদ করে বললেন : 'এটা স্বাভাবিক। সব কিছুই কিছুকাল বাঁচে, তারপর মরার সময় হলে মরে যায়।'

ইককিউ পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো সামনে জড়ো করে রাখলেন, তারপর বললেন : 'আপনার বাটির মরার সময় হয়েছিল।'

সংবাদ

জেন শিক্ষক ছাত্রদের নিজেদের মতো ক'রে ভাব প্রকাশ করতে শেখাতেন। পাশাপাশি দুটো মঠ, দুই মঠেই দুটি বালক ছাত্র

ছিল। একটি ছেলে সকালে শব্জি আনতে যেতো, পথে আরেকটি ছেলের সঙ্গে দেখা হতো।

একদিন একজন বললো : 'কোথায় যাচ্ছো ?'

আরেকজন বললো : 'আমার পা যেখানে যাচ্ছে।' এতে ছেলেটা ঘাবড়ে গেলো, মঠে ফিরে শিক্ষকের কাছে এর জবাব জানতে চাইলো। শিক্ষক বলে দিলেন : 'কাল সকালে যখন ছোকরার সঙ্গে দেখা হবে তাকে এই একই প্রশ্ন করবে। সে এই একই উত্তর দেবে। তখন তুমি বলবে : "ধরো তোমার পা-ই নেই, তুমি তখন কোথায় যাবে ?" সে তখন টের পাবে।'

পরের সকালে ছেলেদুটো আবার মুখোমুখি হলো।

প্রথম ছেলেটি বললো : 'কোথায় যাচ্ছো ?'

আরেকজন বললো : 'হাওয়া যেখানে যাচ্ছে।' এতে ছেলেটা ভড়কে গেল, শিক্ষকের কাছে তার হারের কথা বললো। শিক্ষক বললেন : 'কাল সকালে যখন ছোকরার সঙ্গে দেখা হবে তাকে এই একই প্রশ্ন করবে। সে এই একই উত্তর দেবে। তুমি তখন বলবে : "ধরো হাওয়াই নেই, তুমি তাহলে কোথায় যাবে ?" '

পরের সকালে আবার ছেলেদুটোর দেখা হলো।

প্রথম ছেলেটি বললো : 'কোথায় যাচ্ছো ?'

আরেকজন উত্তর দিল : 'বাজারে শব্জি কিনতে যাচ্ছি।'

খেদ

এক প্রাদেশিক সামন্তপ্রভুর শেষকৃত্যের সময় কাসানকে পৌরোহিত্য

করতে বলা হলো। কাসান এর আগে এত সামন্ত ও অভিজাত মানুষের সংস্পর্শে আসেন নি, তিনি অপ্রতিভ বোধ করছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হলে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লেন।

কাসান ফিরে এসে তাঁর অনুগামীদের ডেকে একত্র করলেন। কাসান স্বীকারোক্তি করলেন যে তিনি এখনো আচার্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেন নি, নির্জন মঠে তাঁর মনে যে সমতার ভাব ছিল তা অভিজাতসমাগমের ফলে কেটে গেছে। এই ব'লে কাসান পদত্যাগ করলেন এবং অন্য একজন জেন সাধকের অনুবর্তী হয়ে থাকলেন। এইভাবে আট বৎসর অতীত হলে তিনি বোধি লাভ ক'রে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে ফিরে এলেন।

সম্রাটের সন্তান

ইয়ামাওকা তেস্‌সু সম্রাটের শিক্ষক ছিলেন। তিনি অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ এবং এক প্রখ্যাত জেন সাধক।

তাঁর গৃহ ভবঘুরের নিবাস ছিল। তাঁর মোটে এক প্রস্ত পোশাক ছিল, কারণ ভবঘুরেদের জন্য তার প্রায় সবই খরচ হয়ে যেত।

সম্রাট তাঁর শিক্ষকের পোশাক জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে দেখে তাঁকে এক প্রস্ত নতুন পোশাক কেনার জন্য কিছু অর্থ দিলেন। পরের দিনও ইয়ামাওকা সেই জীর্ণ পোশাকেই সম্রাটের সামনে আবির্ভূত হলেন।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন : 'নতুন পোশাকের কী হলো, ইয়ামাওকা?'

ইয়ামাওকা বললেন : 'আমি মহামান্য সম্রাটের সন্তানদের পোশাক দিয়েছি।'

কথকের জেন

এনকো নামকরা কথক। তাঁর বলা ভালোবাসার গল্প শ্রোতাদের বুকে সাড়া তোলে, তাঁর বলা রাগের গল্প শ্রোতাদের যুদ্ধে নিয়ে যায়। একদিন এনকোর সঙ্গে ইয়ামাওকা তেস্‌সুর দেখা। ইয়ামাওকা সাধারণ মানুষ, তিনি জেন-সাধনায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ইয়ামাওকা বললেন : 'আমি জানি আপনি এদেশের সেরা কথক, আপনি চাইলেই মানুষকে হাসাতে কাঁদাতে পারেন। আমাকে আমার প্রিয় চেরি ছেলের গল্পটি বলুন। ছেলেবেলায় মায়ের পাশে শুয়ে থাকতাম, মা এই রূপকথা বলতেন, শুনতে শুনতে গল্পের মাঝখানে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মা যেমন করে এই রূপকথা বলতেন ঠিক তেমনটি করে বলুন।'

এনকো সাহস পেলেন না, ইয়ামাওকার কাছে তৈরি হওয়ার সময় চেয়ে নিলেন। কয়েক মাস কাটলো, তিনি ইয়ামাওকার কাছে গেলেন, বললেন : 'আজ আমাকে গল্পটি বলতে দিন।'

ইয়ামাওকা বললেন : 'আজ নয়। অন্য কোনো দিন।' এনকো ভারি হতাশ হলেন, তিনি নিজেকে আরো তৈরি করলেন, আবার ইয়ামাওকার কাছে গেলেন। আবার, আবারও, অনেকবার

ইয়ামাওকা তাঁকে এভাবে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। এনকো কথা বলতে শুরু করলেই ইয়ামাওকা তাঁকে থামিয়ে দিতেন, বলতেন : 'আপনি এখনো আমার মায়ের মতো হন নি।'

পাঁচ বছর পরে মা যেমন করে বলতেন সেভাবেই এনকো গল্পটি ইয়ামাওকাকে বলতে পারলেন। এ রকম করে ইয়ামাওকা এনকোকে জেন শিখিয়েছিলেন।

তর্জনী

গুতেইকে কেউ জেন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তর্জনী তুলে ধরতেন। তাঁর এক তরুণ ছাত্র তাঁকে এদিক থেকে নকল করতে শুরু করলো। গুরু কী শিখিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তর্জনী তুলে ধরতো।

গুতেই ছাত্রটির দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনলেন। তিনি ছাত্রটিকে ধরলেন, তার তর্জনী কেটে ফেললেন। ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদলো, ছুটে পালিয়ে গেল। গুতেই তার নাম ধরে ডাকলেন, তাকে আটকালেন। সে গুতেইয়ের দিকে ফিরে তাকাতেই গুতেই নিজের তর্জনী তুলে ধরলেন। তখনই ছেলেটির বোধিলাভ হলো।

মার্জনা

এক ভিক্ষু যোশুকে বললেন : 'আমি সবে মঠে এসেছি। আপনি আমাকে উপদেশ দিন।'

যোশু জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি ভাত খেয়েছেন ?'

ভিক্ষু বললেন : 'হ্যাঁ।'

যোশু বললেন : 'তা হলে এখন পাত্রটি মেজে ফেলুন।' তখনই ভিক্ষুর বোধিলাভ হলো।

প্রাক্-বুদ্ধ

এক ভিক্ষু সেইজোকে প্রশ্ন করলেন : 'আমি জানি ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে এক বুদ্ধ ছিলেন, তিনি দশ ভবচক্র ধরে ধ্যান করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বোধি লাভ হয় নি, তিনি সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভ করতে পারেন নি। এ রকম কেন হয়েছিল ?'

সেইজো জবাব দিলেন : 'আপনার প্রশ্নেই এর উত্তর আছে।'

ভিক্ষু জানতে চাইলেন : 'বুদ্ধ যদিও ধ্যান করেছিলেন তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারেন নি কেন ?'

সেইজো বললেন : 'তিনি বুদ্ধ ছিলেন না, তাই।'

পাত্র

তোকুসান ধ্যানঘর থেকে খাওয়ার পাত্র নিয়ে খাবার ঘরে গেলেন। সেপ্‌পো রাঁধাবাড়ার কাজ করছিলেন। তোকুসানকে দেখে তিনি বললেন : 'এখনো খাওয়ার ঘণ্টা বাজে নি। আপনি পাত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?'

এই শুনে তোকুসান ঘরে ফিরে গেলেন।

সেপ্‌পো গানতোকে এ কথা বললেন। শুনে গানতো বললেন : 'বুড়ো তোকুসান পরম সত্য কী তা বোঝেন নি।'

তোকুসান এ মন্তব্য শুনলেন, গানতোকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন : 'আমি শুনলাম আমার জ্ঞেনে আপনার সায় নেই।' গানতো সেকথা মেনে নিলেন। তোকুসান কিছু বললেন না।

পরের দিন তোকুসান ভিক্ষুদের পুরোপুরি নতুন ধরনের একটা ভাষণ দিলেন। গানতো হেসে ফেললেন, হাততালি দিয়ে বললেন : 'আমার মনে হয় আমাদের এই বুড়ো পরম সত্য কী তা ঠিকই বোঝেন। সারা চীন দেশে তাঁর মতো আর কেউ নেই।'

তিন ঘা

তোজান উমমোনের কাছে গেছেন। উমমোন জানতে চাইলেন তিনি কোথা থেকে এসেছেন।

তোজান বললেন : 'সাতো গাঁ থেকে।'

উমমোন জানতে চাইলেন : 'গরমকালে কোন মঠে ছিলেন ?'

তোজান বললেন : 'হোজি মঠে, হ্রদের দক্ষিণে।'

উমমোন জানতে চাইলেন : 'সেই মঠ কবে ছেড়ে এলেন ?'

তোজান কতক্ষণ এ রকম তথ্যনির্ভর উত্তর দিয়ে যাবেন তা ভেবে উমমোনের অবাক লাগছিল।

তোজান বললেন : 'বর্ষার শেষ দিনটিতে।'

উমমোন বললেন : 'আপনাকে লাঠি দিয়ে আমার তিন ঘা দেওয়া উচিত। আজকের মতো আপনাকে মাপ করলাম।'

তোজান পরের দিন উমমোনকে বিনতি করে বললেন : ‘গতকাল আপনি আমায় তিন ঘা মাপ করেছেন। আমি জানি না কেন আপনি আমাকে ভুল ভেবেছিলেন।’

উমমোন তোজানের নিস্তেজ উত্তরের জন্য তাঁকে ধমক দিলেন, বললেন : ‘আপনি কোনো কর্মের নন। আপনি এক মঠ থেকে আরেক মঠে নিরর্থক ঘুরে বেড়ান।’

উমমোনের কথা শেষ হওয়ার আগেই তোজান বোধি লাভ করলেন।

অলৌকিক

বানকেই তখন রিউমন মঠে উপদেশ দিচ্ছেন। একজন শিনশু পুরোহিত তাঁর শ্রোতার বৃদ্ধিতে ঈর্ষা করলেন, তিনি বানকেইয়ের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে চাইলেন। বুদ্ধের নাম জপেই মুক্তি আসবে, এই ছিল পুরোহিতের বিশ্বাস।

বানকেইয়ের উপদেশের মাঝখানে এই পুরোহিত এসে হাজির হলেন। তিনি এমন গোলমাল জুড়ে দিলেন যে বানকেইকে আলোচনা থামাতে হলো, তিনি এই হইচইয়ের কারণ জানতে চাইলেন। পুরোহিত খুব জাঁক করে বললেন : ‘শেনশুবাদের প্রতিষ্ঠাতার অলৌকিক শক্তি ছিল। তিনি নদীর এপারে লেখার তুলি নিয়ে বসতেন, ওপারে তাঁর শিষ্য কাগজ নিয়ে বসতো, আর শূন্যে অমিতাভ বুদ্ধের নাম লেখা হয়ে যেত। আপনি কী এরকম

অদ্ভুত জিনিশ করতে পারেন?'

বানকেই উত্তর দিলেন : 'আপনার শেয়াল ঐসব কেরামতি দেখাতে পারে, কিন্তু ওটি জেনের পথ নয়। আমার অলৌকিক ক্ষমতা এই যে আমি খিদে পেলে খাই, আমি তেষ্টা পেলে পান করি।'

ঘুমিয়ে পড়ুন

জেন শিক্ষক তেকিস্যুইয়ের মৃত্যুর তিনদিন আগে গাসান তাঁর বিছানায় বসে ছিলেন। তেকিস্যুই এর মধ্যে গাসানকে তাঁর উত্তর-সূরি ভেবে রেখেছেন।

একটা মঠ কিছু আগে পুড়ে গিয়েছিল, গাসান তা গড়ে তুলছেন। তেকিস্যুই জানতে চাইলেন : 'এই মঠ নতুন করে গড়ে তোলার পর আপনি কী করবেন?'

গাসান বললেন : 'আপনার অসুখ সেরে গেলে আমরা আপনাকে সেখানে ভাষণ দিতে নিয়ে যাবো।'

'ধরুন, আমি যদি ততদিন না বাঁচি।—'

গাসান উত্তর দিলেন : 'তা হলে আমরা আর কাউকে বাছাই করবো।'

'ধরুন, আপনারা আর কাউকে পেলেন না।—'

গাসান চেঁচিয়ে বললেন : 'বোকার মতো এসব প্রশ্ন করবেন না। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।'

জাপানে কম জনই ধুনোদানি বানাতে পারতেন। নাগাসাকির মেয়ে কামে তাঁদের একজন। কামের ধুনোদানি শিল্পকাজরূপে বাড়িতে বাড়িতে চা ঘরে বা পুজোর ঘরে রেখে দেওয়া হতো। কামের বাবাও ধুনোদানি বানাতেন।

কামে মদ পান করতে ভালবাসতেন। তিনি ধূমপান করতেন, পুরুষসংসর্গ করতেন। হাতে টাকা এলে ভোজ দিতেন। তাঁর বাড়িতে কবি শিল্পী শ্রমিক ছুতোর এরকম সব নানা কাজের লোক ও অকাজের লোকদের ডাক পড়তো।

কামে খুব ধীরে ধীরে কাজ করতেন, তবে শেষ হলে সে একটা সেরা জিনিশ হতো। যে সব নারী জীবনে কখনো ধূমপান করলেন না, মদ পানও করলেন না, পুরুষদের সংসর্গও করলেন না, তাঁরাই তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে কামের ধুনোদানি শিল্পকাজ হিশেবে আদর ক'রে রেখে দিতেন।

নাগাসাকির পুরপ্রধান একবার কামের কাছে একটা ধুনো-দানির ফরমাশ করলেন। ছমাস কেটে গেল, কামে তাঁকে ধুনো-দানি দিতে দেরি করছিলেন। এর মধ্যে পুরপ্রধান দূরের এক শহরে বদলি হয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে এসে কামেকে ধুনোদানির জন্য তাগাদা দিয়ে গেলেন।

অবশেষে কামে প্রেরণা পেলেন, ধুনোদানিটি বানালেন। শেষ

হওয়ার পর তিনি সেটি একটা কাঠের চৌকির উপর রাখলেন, তারপর অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে ধুনোদানির দিকে চেয়ে থাকলেন। জিনিশটার সামনে বসে তিনি ধূমপান করলেন, মদ পান করলেন ; ধুনোদানি যেন তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছিল। সারা দিন তিনি ধুনোদানিটা দেখে গেলেন।

সব শেষে কামে একটা হাতুড়ি তুলে নিলেন, ধুনোদানি ঘা মেরে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কামের মন নিখুঁত সৃষ্টি চেয়েছিল, এ সে নির্মাণ নয়।

এক তান

সম্রাটকে দেখা দিয়ে কাকুয়া অদৃশ্য হন। পরে তাঁর কি হয় কেউ জানেন না। জাপানিদের মধ্যে তিনিই প্রথম চীনে গিয়ে জেন শেখেন, একটি তান ছাড়া তিনি জেনের আর কোনো পরিচয় দিতেন না। তিনি জাপানে জেন এনেছেন, একথা তাই কেউ মনেও করতেন না।

কাকুয়া চীনে গিয়েছিলেন, ঋতের পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি ঘোরাঘুরি করতেন না, দূরের পাহাড়ে থেকে সব সময় ধ্যান করতেন। মানুষজন তাঁকে খুঁজে বার করতেন, তাঁকে উপদেশ দিতে বলতেন, তিনি এক-আধটি কথা বলতেন, আরো দূরের পাহাড়ে চলে যেতেন, সেখানে তাঁকে আর তত সহজে খুঁজে পাওয়া যেত না।

সম্রাট জাপানে ফিরে কাকুয়ার কথা শুনলেন, তাঁর আর

প্রজাদেরও জ্ঞানের জন্য কাকুয়াকে জেন উপদেশ দিতে বললেন।

কাকুয়া সম্রাটের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ঢোলা পোশাকের ভেতর থেকে একটা বাঁশি বার করলেন, একটি ছোটো তান বাজালেন। নম্রভাবে বিনতি জানালেন, তারপরে চলে গেলেন।

কথা ও কাজ

জেন সাধক মু-নানের একজনই অনুগামী ছিলেন। তাঁর নাম শোজু। শোজুর জেন শেখা শেষ হলে মু-নান তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে বললেন: 'আমি বুড়ো হয়েছি। শোজু, আমি যতদূর জানি আপনিই এখন আমার ধারা বজায় রেখে চলতে পারবেন। এই পুঁথিখানা নিন। সাধকদের হাতে হাতে এ পুঁথি সাত জন্ম ধরে চলে এসেছে। আমার বোধ অনুযায়ী আমিও এতে কিছু কিছু যোগ করেছি। এ খুব দামি পুঁথি, আপনি যাতে পরের সাধকদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারেন তাই আপনাকে এই পুঁথি দিলাম।'

শোজু বললেন: 'এই পুঁথি যদি এতই দামি হয় তবে আপনার নিজের কাছেই এটি রেখে দেওয়া ভালো। আমি তো না পড়েই আপনার কাছ থেকে জেন শিখেছি আর তাতেই আমি খুশি।'

মু-নান বললেন: 'আমি তা জানি। তবু এই পুঁথি সাত জন্ম ধরে সাধক থেকে সাধকের হাতে হাতে ফিরেছে, জেন শেখার একটি প্রতীকরূপে আপনি এটি রেখে দিন। এই নিন।'

তাঁরা দুজন একটা চুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। শোজু যেই পুঁথিটি পেলেন অমনি তা গনগনে আঁচে গুঁজে দিলেন।

মু-নানকে রাগতে দেখা যায় নি। তিনিও চেঁচিয়ে ব'লে উঠ-লেন : 'আপনি করছেন কি!'

শোজুও পালটা চেঁচালেন : 'আপনি বলছেন কি!'

পাথর মন

চীন দেশের জেন শিক্ষক হোগেন একটা ছোটো মঠে একা থাক-তেন। একদিন চারজন ভিক্ষু সেখানে হাজির হলেন। নিজেদের গা গরম করবেন বলে হোগেনের মঠের আঙিনায় তাঁরা আগুন জ্বালাতে চাইলেন।

তাঁরা যখন আগুন ধরাচ্ছেন তখন হোগেন তাঁদের বাদবিতণ্ডা শুনতে পেলেন। চারজন ভিক্ষু আত্মবাদ ও বস্তুবাদ বিষয়ে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হোগেন তাঁদের তর্কে যোগ দিয়ে বললেন : 'এটা একটা বিরাট বড়ো পাথর। পাথরের এই চাঁইটা আপনাদের মনের ভেতরে না বাইরে?'

ভিক্ষুদের একজন বললেন : 'বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী সব কিছুই মনের বস্তুভূত হওয়ার ফল; সুতরাং আমার মতে পাথরটা আমার মনের মধ্যেই আছে।'

হোগেন মন্তব্য করলেন : 'আপনি যদি আপনার মনে অত

বড়ো একটা পাথর বয়ে নিয়ে বেড়ান তাহলে তো আপনার মাথাটা ভীষণ ভারি লাগার কথা।'

উন্নতি

একজন বিত্তবান মানুষ তাঁর পরিবারের ধারাবাহিক উন্নতিকল্পে বংশপরম্পরায় বহন করার মতো একটি বাণী সেনগাইকে লিখে দিতে বললেন।

সেনগাই একটা বড়ো শাদা পাতা নিলেন, লিখলেন : বাবা মরে, ছেলে মরে, নাতি মরে।

ধনী মানুষটি রেগে গেলেন।—আপনাকে আমার পরিবারের সুখ আর উন্নতির জন্য কিছু লিখে দিতে বললাম, আর আপনি এ কি ঠাট্টা করলেন?

সেনগাই বুঝিয়ে বললেন : 'ঠাট্টা নয়। যদি আপনার আগে আপনার ছেলে মরেন সেটা আপনার খুব দুঃখের কারণ হবে। আর আপনার ছেলের আগে যদি আপনার নাতি মরে, তাহলে আপনারা দুজনেই ভেঙে পড়বেন। কিন্তু আমি যেমন পর পর লিখেছি সেই ধারায় যদি এক একটা প্রজন্ম শেষ হয় তা হলে সেটিই জীবনের স্বাভাবিক ধারা হবে। আমি একেই প্রকৃত উন্নতি বলি।'

রিওকান জেন শেখায় জীবন দিয়েছিলেন। একদিন তিনি শুনলেন তাঁর ভাইপো আত্মীয়দের বারণ শুনছেন না, এক নটীর পিছনে সব টাকা উড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন। রিওকান সরে যাওয়ায় এই ভাইপোর উপরই পরিবারের দায় পড়েছে, ভাইপোটি এভাবে চললে বিষয়-আশয় আর কিছু থাকবে না, তাই আত্মীয়রা রিও-কানকে এ সম্পর্কে কিছু করতে বললেন।

ভাইপোকে অনেক বছর দেখেন নি, রিওকান অনেক পথ পার হয়ে ভাইপোর কাছে এলেন। ভাইপোও কাকাকে আবার দেখতে পেয়ে খুশি হলেন, আর রিওকানকে রাতটুকু তাঁর কাছে কাটিয়ে যেতে বললেন। রিওকান সারারাত জেগে ধ্যান করলেন। ভোরে চলে আসার সময় তিনি ভাইপোকে ডেকে বললেন : 'আমি ঠিক বুড়ো হয়ে গেছি, তাই আমার হাত এত কাঁপছে। তুমি আমার খড়ের চটির ফিতেটা একটু আটকে দেবে ?'

ভাইপো খুশি হয়ে কাজটা করলেন। এজন্য রিওকান ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন : 'দ্যাখো, যত দিন যায় মানুষ ততই দুর্বল হয়, বুড়ো হয়। তুমি ভালোভাবে নিজের যত্ন নাও।' এই কথা ব'লে রিওকান চলে গেলেন। আর সেই সকাল থেকে ভাইপোর উচ্ছৃঙ্খলতাও দূর হয়ে গেল।

মেজাজ

এক জেন-ছাত্র শিক্ষক বানকেই-এর কাছে এসে নালিশ জানালেন: 'মশাই, আমার বেসামাল রাগ হয়। কীভাবে দূর করবো?'

বানকেই বললেন: 'এটা আপনার একটা অদ্ভুত জিনিশ। আমাকে দেখান তো।'

ছাত্র বললেন: 'এখনই দেখাতে পারবো না।'

বানকেই বললেন: 'কখন দেখাতে পারবেন?'

ছাত্র বললেন: 'রাগ হঠাৎ চড়ে ওঠে।'

বানকেই বললেন: 'তা হলে এটা আপনার স্বভাব নয়। এটা যদি আপনার স্বভাব হতো তাহলে আপনি আমাকে যে কোনো সময় রাগ দেখাতে পারতেন। আপনার জন্মানোর সময় রাগ ছিল না, আপনার অভিভাবকরাও আপনাকে রাগ দেন নি। এ ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।'

মৌন

জাপানে জেনের চল হওয়ার আগেকার কথা। চার বন্ধু বসে বসে ধ্যান করেন। তাঁরা একে অপরকে কথা দিয়েছেন যে সাতদিন তাঁরা একে অপরকে কোনো কথা না ব'লে থাকবেন।

প্রথম দিন সবাই চুপ ছিলেন। বেশ ভালো মতন শুরু হয়েছিল। তারপর রাত হতেই তেলের আলোগুলোর তেজ কমে এলো।

একজন ছাত্র পরিচারককে বললেন : 'পলতে উশকে দাও।'

একজনকে কথা বলতে শুনে দ্বিতীয়জন অবাক হয়ে বললেন : 'আমাদের তো কথা না বলার কথা।'

'তোমরা দুটি বোকা, কথা বলছো কেন?' তৃতীয়জন এই প্রশ্ন করলেন।

'একমাত্র আমিই কথা বলি নি' : এই বলে চতুর্থজন আলোচনায় ছেদ টানলেন।

অমূল্য

সোজান নামে এক জেন শিক্ষককে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জিনিশ কী?'

সোজান বলেছিলেন : 'মরা বেড়ালের মুণ্ডু।'

ছাত্রটি জানতে চেয়েছিলেন : 'মরা বেড়ালের মুণ্ডু পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জিনিশ কেন?'

সোজান বলেছিলেন : 'কেউ এর দাম বলতে পারবেন না, তাই।'

বুদ্ধ্ রাজা

দাইগু আর গুদো দুই জেন শিক্ষক, এক রাজা তাঁদের দর্শন চাইলেন। গুদো গিয়ে রাজাকে বললেন : 'আপনি স্বভাবতই জ্ঞানী, আপনার জেন শেখার সহজাত ক্ষমতা আছে।'

দাইগু বললেন : 'আপনার মাথা আর মুণ্ডু। এই বুদ্ধুটাকে এত বাড়াচ্ছেন কেন? ইনি রাজা হতে পারেন, ইনি জেনের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।'

রাজা তখন গুদোর বদলে দাইগুর জন্য একটা মঠ তৈরি ক'রে দিলেন, তাঁর কাছে জেন শিখতেও শুরু করে দিলেন।

বন্ধু

অনেক কাল আগে চীন দেশে দুই বন্ধু ছিলেন। একজন ভালো বীণা বাজাতে পারতেন, আরেকজন সমঝদারের মতো শুনতে পারতেন।

একজন পাহাড়ি রাগ বাজাতেন, আরেকজন বলতেন : 'আমাদের সামনে পাহাড় দেখছি।'

একজন মেঘ রাগ বাজাতেন, আরেকজন বলতেন : 'জল ঝরার শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

তারপর সমঝদার বন্ধুর অসুখ হলো, তিনি মারা গেলেন। বাজিয়ে বন্ধু বীণার তার ছিঁড়ে ফেললেন, তিনি আর কখনো বাজান নি। সেই থেকে তার-ছেঁড়া বীণা বন্ধুতার প্রতীক।

না-কথা, না-স্তব্ধতা

এক ভিক্ষু ফুকেত্‌সুকে প্রশ্ন করলেন : 'কথা না ব'লে, চুপ ক'রে না থেকে কীভাবে সত্য প্রকাশ করবেন?'

ফুকেত্‌সু উত্তর দিলেন: 'আমার সবসময় দক্ষিণ চীনের বসন্ত-কালের কথা মনে পড়ে; সেখানে অসংখ্য সুগন্ধি ফুলের মধ্যে পাখিরা গান গায়।'

ছ-সের

তোজান শন ওজন করছিলেন। এক ভিক্ষু এসে জানতে চাইলেন: 'বুদ্ধ কী?'

তোজান উত্তর দিলেন: 'শনের ওজন ছ-সের!'

নির্বাণ

তোকুসান রিউতানের কাছে জেন শিখছিলেন। এক রাত্রে তিনি রিউতানের কাছে এলেন, তাঁকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

শিক্ষক বললেন: 'রাত বাড়ছে। আপনি বাড়ি ফিরবেন না?'

তোকুসান তখন বিনতি করলেন, পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'বাইরে খুব অন্ধকার।'

রিউতান পথ দেখে চলার জন্য তোকুসানকে একটি বাতি দিলেন। তোকুসান যেই বাতিটি নিয়েছেন, রিউতান অমনি ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

ঘট
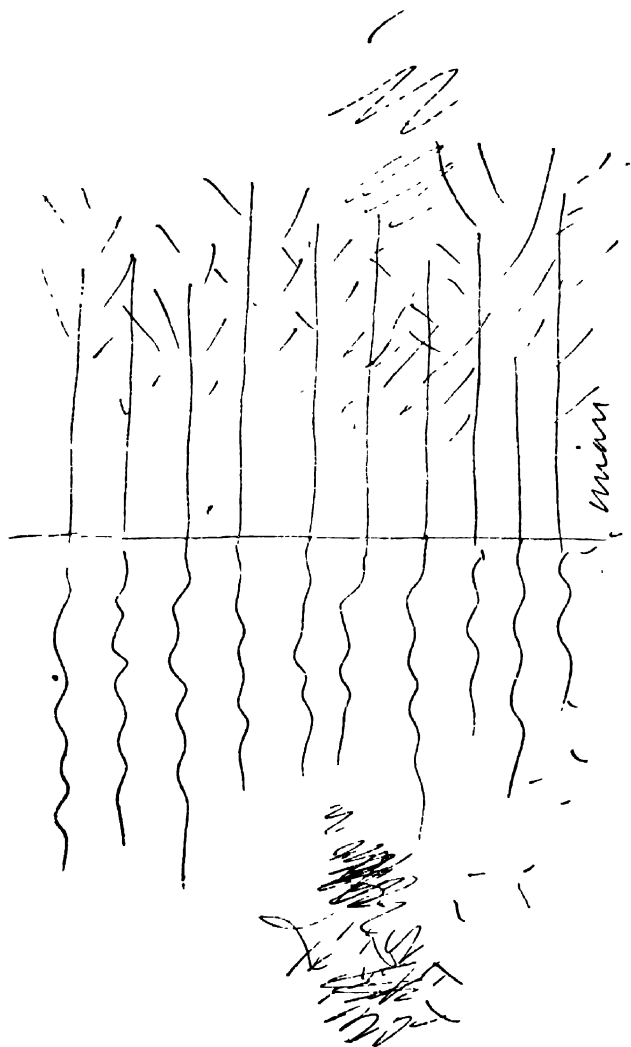
নতুন একটা মঠ বসানোর জন্য হিয়াকুজো একজন ভিক্ষু খুঁজ-

ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বললেন : 'যে একটা প্রশ্নের সবচেয়ে ঠিক উত্তর দিতে পারবেন তাঁকেই নিয়োগ করা হবে।' মাটির উপর একটা ঘট বসিয়ে রেখে তিনি বললেন : 'নাম না ব'লে বলতে হবে এটা কী ? কে বলতে পারবেন ?'

প্রধান ভিক্ষু বললেন : 'এটাকে কেউ কাঠের জুতো বলবেন না।'

পাচক ভিক্ষু ইসান এসে পায়ের ডগা দিয়ে ঘটটি উলটে দিলেন, তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন।

হিয়াকুজো হাসলেন, বললেন : 'প্রধান ভিক্ষু হেরে গেলেন।' আর ইসান নতুন মঠের শিক্ষক হলেন।

বিচ্যুতি

এক জেন ছাত্র উমমোনকে বলেছিলেন : 'বুদ্ধের ভাস্বরতা বিশ্বকে জ্যোতির্ময় করে।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উমমোন প্রশ্ন করলেন : 'অন্যের কবিতা আবৃত্তি করছেন, তাই তো ?'

ছাত্রটি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ।'

উমমোন বললেন : 'আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন।'

পরে শিশিন নামে আরেক শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'ছাত্রটি ঠিক কোন্ জায়গায় পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন ?'

দর্শন

এক দার্শনিক বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন : 'কথা ছাড়া, না-কথা ছাড়া, আপনি কী সত্য বলতে পারবেন ?'

বুদ্ধ মৌন থাকেন।

দার্শনিক বুদ্ধকে বিনতি করেন, ধন্যবাদ জানান এবং বলেন : 'আপনার করুণায় আমার মোহ দূর হলো, আমি ঋতপথে প্রবেশ করলাম।'

দার্শনিক চলে যাবার পর আনন্দ বুদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন : 'উনি কী লাভ করলেন ?'

বুদ্ধ উত্তরে বললেন : 'ভালো ঘোড়া চাবুকের ছায়া দেখেও ছোটে।'

দীক্ষা

এক ভিক্ষু এক বুড়ির কাছে তাইজান মঠে যাবার পথ জানতে চাইলেন। যাঁরা জ্ঞানযোগী তাইজান তাঁদের জায়গা। বুড়ি বললেন : 'সামনে সোজা এগিয়ে যান।' ভিক্ষু কয়েক পা এগিয়ে গেলে বুড়ি নিজের মনে বললেন : 'এও এক সাধারণ যাত্রী।'

যোশুকে কেউ একথা বলেছিলেন। শুনে যোশু বললেন : 'দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।' পরের দিন তিনি গেলেন, একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, বুড়ির থেকে একই উত্তর পেলেন।

যোশু মন্তব্য করলেন : 'বুড়িটিকে আমার দেখা হয়ে গেছে।'

নিশীথে
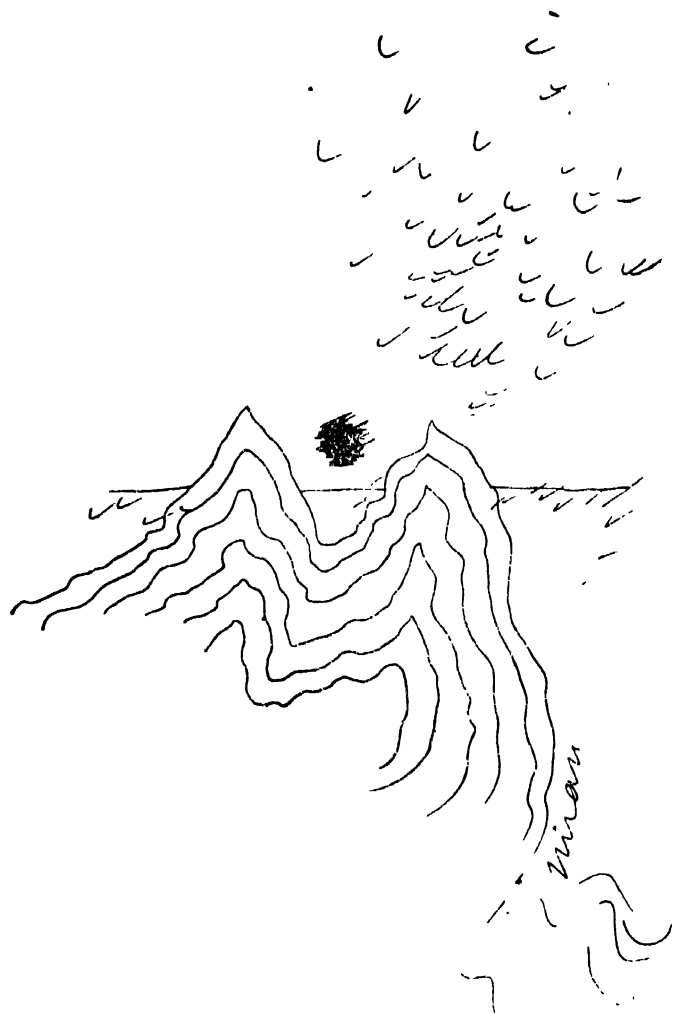
জেন শিক্ষক শেন্‌গাই-এর পরিচালনায় অনেক ছাত্র জেন অভ্যাস করতেন। তাঁদের একজন প্রায়ই রাত্রে উঠে মঠের দেওয়াল টপ্‌কে শহরের এক সরাইখানায় যেতেন।

শেন্‌গাই এক রাতে ছাত্রাবাসে গিয়ে দেখলেন ছাত্রটি নেই, কাঠের একটা চৌকিতে পা রেখে দেওয়াল টপ্‌কে ছাত্রটি শহরে পালিয়েছেন। শেন্‌গাই চৌকিটি দেওয়ালের গা থেকে সরিয়ে নিলেন এবং নিজে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ছাত্রটি ভোর রাতে ফিরে এলেন। চৌকির জায়গায় শেন্‌গাই দাঁড়িয়ে আছেন না জেনে তিনি শেন্‌গাই-এর ঘাড়ে পা রেখে প্রাচীর থেকে মঠের ভিতরে মাটিতে নেমে পড়লেন। তারপর কী করেছেন বুঝতে পেরে তাঁর অবস্থা কাহিল।

শেন্‌গাই বললেন : 'ভোররাতে বেশি হিম পড়ে। দেখো যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।'

ছাত্রটি তারপর থেকে রাত্রে আর বাইরে যান নি।

পরম পাঠ

আগেকার জাপানে ভেতরে মোমবাতি দেওয়া বাঁশ আর কাগজের লণ্ঠনের চল ছিল। এক অন্ধ রাতে এক বন্ধুর বাড়ি যাওয়ায় বন্ধুটি তাঁকে এরকম একটি লণ্ঠন দিতে চাইলেন।

অন্ধ বললেন : 'আমার লণ্ঠন লাগবে না। আলো হোক আর অন্ধকার হোক, আমার কাছে সব সমান।'

বন্ধু বললেন : 'আমি জানি তোমার পথ দেখতে আলো লাগে না! কিন্তু যদি তোমার আলো না থাকে, অন্ধকারে কেউ তোমার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। তাই বলছি, লণ্ঠন নাও।'

অন্ধ মানুষটি লণ্ঠন হাতে মোটে একটুখানি এগিয়েছেন এমন সময় তাঁর সঙ্গে কাব ধাক্কা লাগলো। অন্ধ মানুষটি অচেনা লোকটিকে বললেন : 'দেখে চলুন। লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ছে না?'

অচেনা মানুষটি তখন বললেন : 'ভাই, আপনার বাতি নিবে গিয়েছে।'

এক ফোঁটা

জেন শিক্ষক গিসান তাঁর এক তরুণ ছাত্রকে স্নানের জন্য এক পাত্র জল আনতে বললেন।

শিক্ষকের স্নান সারা হলে ছাত্রটি পাত্রের বাকি জলটুকু মাটিতে ফেলে দিলেন।

শিক্ষক বললেন : 'গর্দভ, জলটা গাছে দিলে না কেন? তোমাকে এই মঠের এক ফোঁটা জলও নষ্ট করার অধিকার কে দিয়েছে?'

তরুণ ছাত্রটি তখনই জেন লাভ করলেন। তখন তাঁর নাম হলো তেকিস্যুই। তেকিস্যুই মানে একফোঁটা জল!

miau
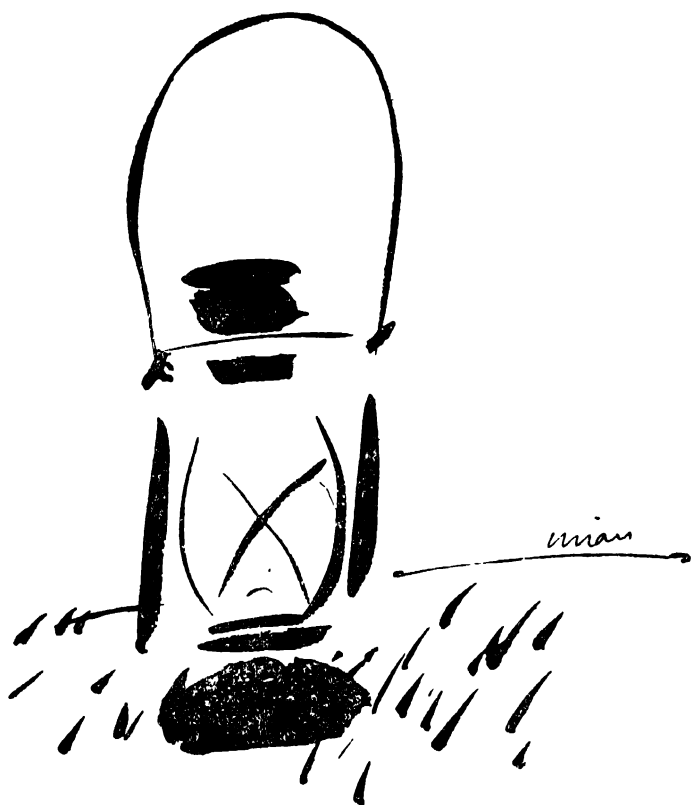
একদল জাপানি সৈনিক একবার যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিলেন। সেনাপতিদের অনেকে গাসানের মঠে থানা গেড়ে বসেছিলেন।

গাসান পাচককে বলেছিলেন : 'আমরা যেমন সাধারণ খাই ওদের জন্যও তেমনি রান্না হবে।'

এতে সেনাপতিদের রাগ হলো। কারণ তাঁরা বিশেষ ব্যবহার পেয়ে এসেছেন। তাঁদের একজন গাসানের কাছে এসে বললেন : 'জানেন, আমরা কে? আমরা সৈনিক, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে চলেছি। আমাদের সেইমতন সমাদর করছেন না কেন?'

গাসান কঠিন স্বরে বললেন : 'জানেন, আর আমরা কে? আমরা মানবতার সৈনিক, সব জীবের মঙ্গল সাধন আমাদের লক্ষ্য।'

নিয়তির হাত

নোবুনাগা নামের এক বড়ো জাপানি যোদ্ধা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করবেন ঠিক করলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা বিপক্ষের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাঁরাই জিতবেন। তাঁর সৈন্যদের অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

যাওয়ার পথে নোবুনাগা এক শিন্টো মঠে থামলেন, সৈন্যদের বললেন : 'পুজো দিয়ে এসে আমি একটা মুদ্রা নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবো। যদি এই সামনের দিকটা পড়ে তাহলে আমরা জিতবোই।

আর যদি পেছনের দিকটা পড়ে তাহলে আমরা হারবো। আমরা নিয়তির হাতে।'

নোবুনাগা মঠের ভিতরে গেলেন, স্তব্ধ হয়ে প্রার্থনা করলেন, তারপর বেরিয়ে এসে মুদ্রাটি দুলিয়ে উপরে ছুঁড়ে দিলেন। সামনের দিকটাই পড়লো। সৈন্যরা এমন উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করলেন যে তাঁরা সহজেই জয়ী হলেন।

যুদ্ধের পর নোবুনাগার অনুচরটি বললেন: 'নিয়তির হাত কেউ পালটাতে পারে না।'

'কেউই পারেন না'—নোবুনাগা বললেন। তিনি মুদ্রাটি বার করে দেখালেন। মুদ্রাটি বিশেষভাবে প্রস্তুত, তাতে দুটো পিঠই একরকম ছিল, পেছনের দিক ব'লে কিছু ছিল না।

নিরাসক্তি

এইহেই মঠের যাজক কিতানো গেম্‌পো বিরানব্বই বছরে গত হন। তিনি সারা জীবন কোনো কিছুতে জড়িয়ে না পড়ার সাধনা করেছেন।

তিনি তেইশ বছর বয়সে বিশ্ববীক্ষার গহন পুঁথি ই-কিং পাঠ করছিলেন। সে বার শীতে তাঁর কিছু বাড়তি গরম পোশাকের প্রয়োজন হয়েছিল। শতক্রোশ দূরে তাঁর জেন গুরু থাকেন, তাঁর দরকারের কথা জানিয়ে তিনি এক পথিকের হাতে গুরুর উদ্দেশে এক পত্র দিলেন। পুরো শীত ঋতু প্রায় কেটে গেল, না চিঠি না
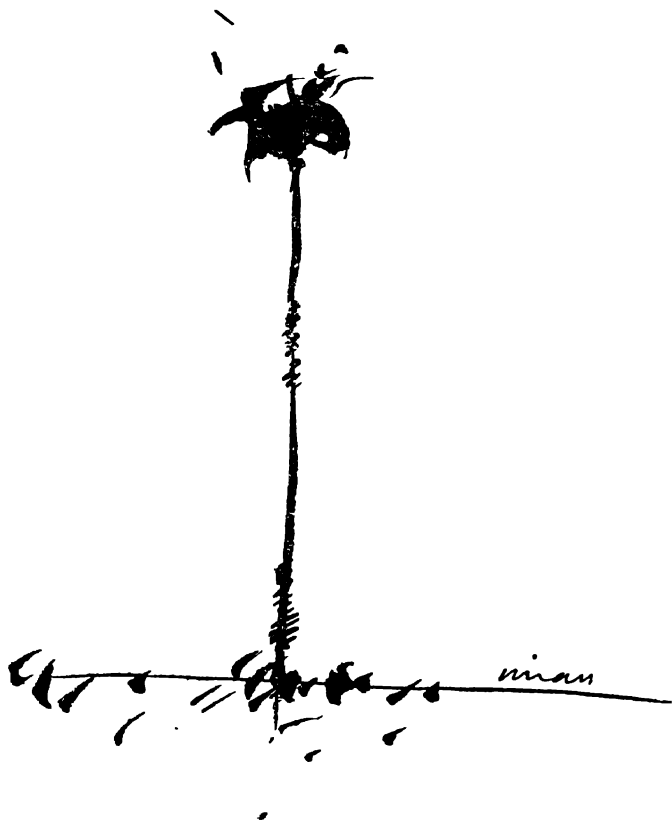
পোশাক কিছুই এলো না। তিনি ই-কিং পুঁথির সাহায্যে জানলেন তাঁর পাঠানো ডাক যথাস্থানে পৌঁছয় নি। কিছু পরে গুরুর চিঠি এলো, তাতে পোশাকের কোনো উল্লেখ ছিল না।

পুঁথি দিয়ে যদি এমন যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারি তা হলে আর পড়ে কাজ কী : এই ভেবে কিতানো ঐ আশ্চর্য পাঠের অভ্যাস ত্যাগ করলেন। তিনি জীবনে আর কোনোদিন ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার প্রয়োগও ঘটান নি।

যখন তাঁর আটাশ বছর বয়স তখন তিনি কবিতা রচনা ও চৈনিক অক্ষরাঙ্কন অভ্যাস করছিলেন। পাঠে তাঁর দ্রুত উন্নতি দেখে তাঁর শিক্ষক তাঁর প্রশংসা করলেন। শুনে কিতানো ভাবলেন : আমি যদি এবার পাঠে বিরতি না দিই তাহলে কবি হয়ে যাবো, আর জেন শিক্ষক হতে পারবো না। তারপরে তিনি আর একটিও কবিতা লেখেন নি।

স্তব্ধ মঠ

শোইচি নামে এক বোধিতে দীপ্ত একচক্ষু শিক্ষক ছিলেন। তিনি তোফুকু মঠে শিক্ষা দিতেন।

তোফুকু মঠ দিন রাত্রি স্তব্ধ থাকতো। কোথাও একটুও শব্দ হতো না।

শিক্ষক সূত্রপাঠও নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্ররা শুদ্ধ ধ্যান করতো।

শিক্ষকের প্রয়াণ ঘটলে এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আবার ঘণ্টার

ধ্বনি এবং সূত্রের আবৃত্তি শুনতে পেলেন। তিনি বুঝলেন শোইচি গত হয়েছেন।

তোসুইয়ের মদ

জেন শিক্ষক তোসুই মঠবাসের প্রথাসিদ্ধ রীতি ত্যাগ করে এক সাঁকোর তলায় ভিখারিদের সঙ্গে থাকতেন। তিনি খুব অথর্ব হয়ে পড়লে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ভিক্ষা ছাড়া অন্য বৃত্তিতে জীবিকা অর্জনের সহায়তা করেন। বন্ধুটি তোসুইকে কিভাবে ধান সংগ্রহ করে মদ তৈরি করতে হয় দেখিয়ে দেন। সেই থেকে তোসুই আমৃত্যু ধেনো মদ তৈরি করতেন।

একদিন তোসুই যখন মদ বানাতে ব্যস্ত তখন একটি ভিখারি তাঁকে বুদ্ধের একটি পট দিলেন। তোসুই ঘরের দেওয়ালে পটটা টাঙিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু তলায় একটি লিখন জুড়ে দিলেন। লিখনটি এই :

মহাশয় অমিতাভ বুদ্ধ, আমার এ কক্ষটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। বিদেহী সত্তারূপে আপনাকে এখানে কোনোমতে থাকতে দিতে পারি। কিন্তু আপনাকে এখানে অবতীর্ণ হবার সুযোগ দিতে পারবো না বলে দুঃখিত।

ধন্যবাদ

সেইসেত্সু তখন কামাকুরা প্রদেশের এনগাকু মঠের জেন শিক্ষক।

তিনি যে সব ধ্যানঘরে জেন শিক্ষা দিতেন সেসব জায়গায় খুব ভিড় হতো, তিনি তাই ঘর বাড়াতে চাইছিলেন। উমেজু নামে ইদোর এক বণিক এজন্য পাঁচশো রায়ো বা পাঁচশো সোনার টুকরো দান করবেন ঠিক করলেন। শিক্ষকের কাছে ঐ অর্থ নিয়ে আসা হলো।

সেইসেত্সু বললেন : 'বেশ, আমি নেবো।'

উমেজু সেইসেত্সুকে সোনার থলিটি দিলেন। জেন শিক্ষকের ধরন দেখে তাঁর ভালো লাগছিল না। তিন রায়োতে এক গৃহস্থের সংবৎসর চলে যায়, আর তিনি পাঁচশো রায়ো দিয়েছেন। এজন্য সেইসেত্সু তাঁকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলেন না।

উমেজু ইঙ্গিত করে বললেন : 'এই থলিতে পাঁচশো রায়ো আছে।'

সেইসেত্সু উত্তর দিলেন : 'আপনি এ কথা আগে বলেছেন।'

উমেজু বললেন : 'আমি যদিও ধনী বণিক তবু আমার মনে হয় পাঁচশো রায়ো সে অনেক টাকা।'

সেইসেত্সু জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কী চান আমি আপনাকে এজন্য ধন্যবাদ দিই ?'

উমেজু বললেন : 'আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

সেইসেত্সু জানতে চাইলেন : 'আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কেন ? যিনি দান করেছেন তিনিই তো ধন্যবাদ দেবেন।'

বানকেই-এর মঠের সূপকার ভিক্ষু দায়রায়ো ঠিক করলেন যে তিনি তাঁর বুড়ো গুরুকে ভালো করে দেখাশোনা করবেন, তাঁকে টাটকা খাবার খেতে দেবেন। বানকেই দেখলেন তাঁকে মঠের অন্য শিষ্যদের খাবারের চেয়ে বেশি ভালো তরকারি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন : 'আজকের সূপকার কে ?'

দায়রায়োকে ডেকে পাঠানো হলো। বানকেই জানলেন যে বয়স আর পদ অনুযায়ী একমাত্র তাঁরই টাটকা তরকারি খাওয়ার কথা। 'তা হলে আপনারা চান যে আমি কিছুই না খাই' : এই ব'লে বানকেই তখন ঘরে ঢুকে গেলেন, আগল তুলে দিলেন।

দায়রায়ো দরজার কাছে বসে গুরুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বানকেই উত্তর দিলেন না। সাত দিন দায়রায়ো বাইরে বসে থাকলেন, সাত দিন বানকেই ভিতরে। শেষে আর না পেরে এক চেলা চেঁচিয়ে বললো : 'বুড়ো গুরু, আপনি ভালো থাকতে পারেন, কিন্তু এই ছোকরা শিষ্যকে তো খেতে হবে। বিনা খাবারে তার তো চিরকাল চলবে না।'

তখন বানকেই দরজা খুললেন। তিনি হাসছিলেন। তিনি দায়রায়োকে বললেন : 'আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে একই খাবার খেতে চাই। তুমি যখন গুরু হবে তখন যেন একথা ভুলে যেয়ো না।'

ডাকসাইটে জেন গুরু ইককিউ রাজার ছেলে ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর মা প্রাসাদ ছেড়ে মঠে গিয়ে জেনের পাঠ নিয়েছিলেন। একইভাবে ইককিউ জেন শেখেন। মরার আগে মা তাঁর জন্য একটি চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। চিঠিটি এই :

ইককিউর প্রতি :

আমি এই জীবনের কাজ শেষ করেছি, এখন চিরজীবনে ফিরে চললাম। আমি চাই তুমি ভালো করে পাঠ নেবে, তোমার বুদ্ধ-স্বভাব বুঝতে পারবে। আমি নরকে গিয়েছি কিনা, আমি সব সময় তোমার পাশে আছি কি নেই, এসবও জানতে পারবে।

তুমি যদি বুঝতে পারো যে বুদ্ধ ও তাঁর অনুগামী বোধিধর্ম তোমার চাকরবাকর তা হলে তোমার আর জেন শেখার দরকার নেই, তা হলে তুমি মানুষের কাজে লেগে যেতে পারো। বুদ্ধ নয়-চল্লিশ বছর উপদেশ দিয়েছিলেন আর সবসময়ই বুঝেছিলেন যে একটাও কথা বলার কোনো দরকার নেই। কেন বুঝেছিলেন তা তোমার জানা উচিত। তবে তুমি যদি বুঝতে না পারো, যদি তুমি বুঝতে না চাও, তাহলে অযথা ভাবাভাবি ছেড়ে দাও।

তোমার মা

অজাত, অমৃত

পয়লা শরৎ

অনুলেখ : বুদ্ধের উপদেশ মূলত অন্যদের বোধিজ্ঞান দেওয়ার জন্য। তুমি যদি বুদ্ধবাদের যে কোনো যানের উপর নির্ভর করো

তাহলে তুমি বোকা পোকা ছাড়া আর কিছু না। বুদ্ধবাদ বিষয়ে আশি হাজার বই আছে, তুমি যদি সেই সব বইই পড়ো, তারপরেও তোমার নিজের স্বভাব বুঝতে না পারো, তা হলে তুমি এই চিঠিটাও বুঝতে পারবে না। এই আমার সমাচার এবং ইষ্টিপত্র।

স্বচ্ছ বোধ

রিওনেন নামের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী জাপানের অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর কবিতা রচনার প্রতিভা আর তাঁর আকর্ষণীয় সৌন্দর্য এমন ছিল যে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই তিনি সম্রাজ্ঞীর সখীর পদ পেয়েছিলেন। এই তরুণ বয়স, এখনো তাঁর খ্যাতির অনেক বাকি ছিল। কিন্তু প্রিয় সম্রাজ্ঞীর অকালের মৃত্যুতে তাঁর আশার স্বপ্ন ভেঙে গেল। তাঁর মনে নশ্বরতার প্রখর বোধ জন্ম নিল। এই সময় তিনি জেন শিক্ষার কথা ভাবলেন।

কিন্তু তাঁর স্বজনেরা আপত্তি করলেন, তাঁরাই তাঁকে বিবাহ করতে একপ্রকার বাধ্য করলেন। তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি ভিক্ষুণী হয়ে যাবেন এই শর্তে তিনি বিয়েতে সায় দিলেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে তিন সন্তানের জননী হলেন। তখন তাঁর স্বামী আর আত্মীয়রা তাঁকে আর নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তিনি মস্তক মুণ্ডন করলেন, রিওনেন বা স্বচ্ছ-বোধ নাম নিলেন এবং তীর্থে যাত্রা করলেন।

রিওনেন তেত্‌সুগিউকে গুরু করতে চাইলেন। জেন শিক্ষক একনজরে তাঁকে শিষ্যা হিশেবে নাকচ করলেন কারণ রিওনেন

বড়ো বেশি সুন্দরী। রিওনেন তখন হাকুয়ো নামে আরেক জেন শিক্ষকের কাছে গেলেন। তিনিও একই কারণে রিওনেনকে শিষ্যা রূপে নিতে চাইলেন না, বললেন যে রিওনেনের রূপ বিপদ ডেকে আনবে।

রিওনেন একতাল গরম লোহা তুলে নিলেন, নিজের মুখের উপর তা চাপিয়ে দিলেন। কয়েক নিমেষে তাঁর সৌন্দর্য মুছে গেল।

হাকুয়ো তখন তাঁকে শিষ্যা বলে স্বীকার করলেন।

কালো-নাক বুদ্ধ

এক ভিক্ষুণী বোধের সন্ধানে বেরিয়ে একটি বুদ্ধমূর্তি গড়লেন এবং তা সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন। তিনি যেখানে যেতেন সঙ্গে ক'রে এই বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যেতেন।

বেশ কয়েক বৎসর পরে সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধমূর্তিটি সঙ্গে ক'রে কোনো প্রদেশের ছোটো একটি মঠে বসবাস করতে এলেন। সেই মঠে আরো অনেক বুদ্ধমূর্তি ছিল।

এই ভিক্ষুণী কেবল তাঁর বুদ্ধের জন্যই ধূপ জ্বালাবেন ভাবলেন। তাঁর বুদ্ধের জন্য দেওয়া ধূপের সুবাস অন্যান্য বুদ্ধদের নাকে যাওয়ার ব্যাপারটি তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি এমন একটা চুঙির ব্যবস্থা করলেন যা দিয়ে ধূপের ধোঁয়া শুধুমাত্র তাঁর বুদ্ধ-মূর্তির কাছেই গিয়ে উঠবে। এর ফলে তাঁর সোনার বুদ্ধমূর্তিটির নাক কালো হয়ে গেল এবং সেটিকে বিশেষভাবে কুৎসিত মনে হলো।

জেনকাই নামে এক সামুরাইয়ের সন্তান ইদো অঞ্চলে গিয়ে এক উচ্চপদের কর্মচারীর অধীনে কাজ শুরু করেন। তিনি ঐ পদস্থ ব্যক্তিটির স্ত্রীর প্রেমে পড়েন এবং তাঁদের প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে যায়। নিজের মুখরক্ষার জন্য তিনি পদস্থ ব্যক্তিটিকে হত্যা করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যান। কালক্রমে তাঁরা দুজন চোরে পরিণত হন। মহিলার লোভ দেখে জেনকাই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহিলাটিকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি সুদূর বাজেন প্রদেশে চলে যান এবং এক রমতা সাধু হয়ে পড়েন।

অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করতে জেনকাই তাঁর জীবৎকালে কোনো সৎ কাজ করার সংকল্প করেন। পাহাড় থেকে খাড়া ঝুঁকে পড়া এক বিপজ্জনক পথ ছিল, সে পথে বহুসংখ্যক মানুষ আহত ও নিহত হতেন : তিনি সেই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ কাটবেন স্থির করলেন। জেনকাই দিনের বেলা ভিক্ষা করে কাটাতেন, আর তাঁর রাত সুড়ঙ্গ কাটায় অতিবাহিত হতো। তিরিশ বছর পার হয়ে গেলে সুড়ঙ্গটি লম্বায় প্রায় দেড় হাজার হাত, চওড়ায় কুড়ি হাত এবং উচ্চতায় তেরো হাত হলো।

কাজ শেষ হতে তখনো দুবছর বাকি। এমন সময় সেই নিহত কর্মচারীর সন্তান জেনকাইকে খুঁজে বার করলেন। তিনি তলোয়ার চালানোয় নিপুণ, তিনি জেনকাইকে হত্যা করে প্রতি-শোধ নিতে এসেছেন। জেনকাই তাঁকে বললেন : 'আমি নিজের থেকেই জীবন দিয়ে দেবো। আপনি আমায় এ কাজটি শেষ

করতে দিন, তারপর আপনি আমায় শেষ করতে পারবেন।'

সন্তানটি সেদিনের অপেক্ষায় থাকলেন। কয়েক মাস কেটে গেল, জেনকাই সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছেন। সন্তানটি কাজ না ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, শেষে জেনকাইয়ের সঙ্গে খোঁড়ার কাজে হাত লাগালেন। এক বছর হয়ে গেল, সন্তানটি ততদিনে তাঁর পিতৃহন্তার দৃঢ় প্রত্যয় ও চরিত্রবলের শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন।

অবশেষে খননের কাজ সমাধা হলো, লোকজন নিরাপদে সুড়ঙ্গ দিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

জেনকাই বললেন : 'এবার আমার মাথা কেটে ফেলুন। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

তরুণটি জলভরা চোখে জানতে চাইলেন : 'আমি আমার গুরুর মাথা কীভাবে কাটবো?'

সম্রাট ও সাধক

সম্রাট গোয়োজেই গুদোর কাছে জেনের পাঠ নিতেন। একদিন তিনি জানতে চাইলেন : 'জেন সাধনায় এই মনই বুদ্ধ। একথা ঠিক তো?'

গুদো বললেন : 'আমি যদি 'ঠিক' বলি তা হলে তুমি না বুঝেও বুঝে ফেলেছো ভাববে। আর আমি যদি 'ভুল' বলি তাহলে অনেকে যা বেশ ভালোভাবেই জানেন আমি তার উল্‌টো কথা বলবো।'

আরেকদিন সম্রাট জানতে চাইলেন : 'বোধি লাভ করার পর মানুষ কোথায় যায় ?'

গুদো বললেন : 'আমি জানি না।'

'জানেন না কেন ?'—সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন।

গুদো উত্তর দিলেন : 'কারণ আমি এখনো মরি নি।'

সম্রাট এরপর থেকে তিনি যা বোঝেন না তা জেন সাধককে জিজ্ঞাসা করতে ইতস্তত করতেন। গুদো তখন হাত দিয়ে কাঠের মেজে চাপড়ে গোয়োজেইকে জাগিয়ে দিলেন, সম্রাট এভাবে বোধি লাভ করলেন।

খত

নিনাকাওয়া মারা যাওয়ার ঠিক আগে জেনগুরু ইককিউ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ইককিউ জানতে চাইলেন : 'আমি কী আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।'

নিনাকাওয়া জবাব দিলেন : 'আমি একা এসেছি, আমি একা যাবো। এখানে আপনি আমাকে এগিয়ে দেবেন কী ক'রে ?'

ইককিউ বললেন : 'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আপনি এসেছেন আর আপনি যাবেন তাহলে তা আপনার ভুল ভাবনা। আসুন, আমি আপনাকে সেই পথ দেখাবো যেখানে যাওয়া নেই আর আসাও নেই।'

এই কথা দিয়ে ইককিউ এত ভালোভাবে পথ দেখালেন যে নিনাকাওয়া শুনে হাসলেন আর তখনই মারা গেলেন।

নোবুশিগে নামে এক সেপাই হাকুউনের কাছে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন : 'স্বর্গ আর নরক ব'লে সত্যই কী আছে?'

হাকুউন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কে?'

সেপাইটি জবাব দিলেন : 'আমি একজন সামুরাই।'

হাকুউন বললেন : 'আপনি সেপাই! আপনি রাজাকে কীভাবে পাহারা দেবেন? আপনার মুখখানা তো ভিখারির মতো।'

একথা শুনে নোবুশিগে খুব রেগে গিয়ে তাঁর তলোয়ার বার করতে যাবেন এমন সময় হাকুউন বললেন : 'আপনার আবার তলোয়ারও আছে। তবে আপনার তলোয়ারটা বোধহয় ভোঁতা, ওতে আমার মাথা কাটা যাবে না।'

নোবুশিগে যখন তলোয়ার বার করে ফেলেছেন তখন হাকুউন বললেন : 'এই নরকের তোরণ খুলে গেল।'

একথা শুনে সামুরাই জেনগুরু হাকুউনের জোর বুঝতে পারলেন, খোলা তলোয়ার খাপে ভরে ফেলে তাঁকে বিনতি করলেন।

হাকুউন বললেন : 'এই স্বর্গের তোরণ খুলে গেল।'

—